ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) –এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব

মূল ঃ অধ্যাপক ডঃ মোঃ মাসউদ আহ্‌মদ (পাকিস্তান)

অনুবাদ ঃ কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন।

মুখবন্ধ

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন বেরেলভী রহমতুল্লাহে আলাইহে (১৮৫৭-১৯২১ ইং) ছিলেন ইসলামী বিশ্বের একজন জ্ঞানী-গুণী ও প্রতিভাধর আলেম। আমি ১৯৭০ ইং সালে এ পুণ্যাত্মার উপর গবেষণা শুরু করি। সেই সময় আমাদের পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবী মহল এ প্রতিভাধর ব্যক্তির সাথে পরিচিত ছিলেন না। আমিও তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলাম না। অতঃপর বিগত বিশ বছর যাবত আমি আমার গবেষণা চালিয়ে আসছি। এ প্রতিভাধর আলেমের উপর আমি নিম্নলিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছি ঃ

১। ইসলামী বিশ্বকোষ (উর্দু)-পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর, পাকিস্থান।
২। ইসলামী বিশ্বকোষ (ইংরেজী)-ক্রোড়পত্র, প্যারিস, ফ্রান্স।
৩। পাকিস্তান জাতীয় হিজরী কাউন্সিল- ইসলামবাদ, পাকিস্তান।
৪। ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট- ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।
৫। এনসাইক্লোপেডিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন - তেহ্‌রান, ইরান।
৬। ইসলামী সভ্যতা সংক্রান্ত রাজকীয় গবেষণা একাডেমী - আম্‌মান, জর্দান।
৭। ইমাম আহ্‌মদ রেযা গবেষণা ইনস্টিটিউট – করাচী, পাকিস্তান।
৮। পাকিস্তান জাতীয় হিজরী কাউন্সিল – ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

এ সকল গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাড়াও আমি ২০টি গ্রন্থ সংকলণ করেছি, বহু নিবন্ধ লিখেছি এবং ৫০টিরও অধিক সাধারণ প্রবন্ধ সরবরাহ করেছি। আমি নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থাগুলোকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যাঁরা সম্পূর্ণভাবে আমাকে সহযোগিতা দান করেছেন এবং এ গবেষণাকর্মকে প্রকাশ করে সারা বিশ্বে প্রচার করেছেন ঃ

১। মারকাযে মজলিসে রেযা, লাহোর, পাকিস্তান।
২। এদারায়ে তাহ্‌কিকাতে ইমাম আহ্‌মদ রেযা, করাচী, ঐ।
৩। ইসলামিক একাডেমী, মুবারকপুর, ভারত।
৪। রেযা একাডেমী, লাহোর, পাকিস্তান।
৫। জমিয়াতে আহ্‌লে সুন্নাত, হায়দরাবাদ, পাকিস্তান।
৬। সুন্নী রেযভী সোসাইটি, ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা।
৭। রেযা ইন্টারন্যাশানাল একাডেমী, সাদিকাবাদ, পাকিস্তান।
৮। রেযা একাডেমী, বোম্বে, ভারত।
৯। রেযা একডেমী, ম্যানচেষ্টার, যুক্তরাজ্য।
১০। মারকাযে মজলিসে ইমাম আযম, লাহোর, পাকিস্তান।

এ সকল গবেষণা কর্মের ফলশ্রুতিতে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে গিয়েছেন। পন্ডিতবৃন্দ এই অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং নিম্ন বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান গুলোতে গবেষকগণের পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকগণও গবেষণা কর্ম হাতে নিয়েছেনঃ

১। বার্কলী ইউনিভার্সিটি - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
২। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি - নিউ ইয়র্ক, ঐ।
৩। লিডেন ইউনিভার্সিটি - লিডেন, হল্যান্ড।
৪। ডারবান ইউনিভার্সিটি - ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা।
৫। পাটনা ইউনিভার্সিটি - আলীগড়, ভারত।
৬। মুসলিম ইউনিভার্সিটি - আলীগড়, ভারত।
৭। উসমানীয়া ইউনিভার্সিটি - হায়দরাবাদ, ভারত।
৮। সিন্দ ইউনিভার্সিটি - জামসোরো, পাকিস্তান।
৯। করাচী ইউনিভার্সিটি - করাচী, পাকিস্তান।
১০। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি - লাহোর, পাকিস্তান।
১১। বাহাউদ্দীন যাকারিয়া ইউনিভার্সিটি - মুলতান, ঐ।
১২। ইমাম আহ্‌মদ রেযা রিসার্চ ইনসটিটিউট - করাচী, ঐ।
১৩। মদীনাতুল হিক্‌মত হামদর্দ ফাউন্ডেশন - করাচী, ঐ।
১৪। জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামীয়া ইউনিভার্সিটি - নতুন দিল্লী, ভারত।
১৫। হামদর্দ ইউনিভার্সিটি - নতুন দিল্লী, ঐ।
১৬। বারমিংহাম ইউনিভার্সিটি - যুক্তরাজ্য।
১৭। নিউ কাসেল ইউনিভার্সিটি - ঐ।

১৮। ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশন সেন্টার - করাচী, পাকিস্তান।
১৯। আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি - ইসলামাবাদ, ঐ।
২০। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি - ক্যালকাটা, ভারত।
২১। জামে' আল আযহার ইউনিভার্সিটি - কায়রো, মিসর।
২২। ইবনে সৌদ ইউনিভার্সিটি - রিয়াদ, জাযিরাতুল আরব।

এটা জানা গেছে যে, ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর উপর গবেষণাকারী কিছু জ্ঞান বিশারদ ভারতের নিম্ন বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে রেজিস্টার করেছেন কিংবা রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করেছেন ঃ

১। রোহাইলখান্দ্ ইউনিভার্সিটি - বেরেলী, ভারত।
২। দেবী আহ্লিয়া ইউনিভার্সিটি - লাহোর, পাকিস্তান।
৩। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি - এলাহাবাদ, ভারত।
৪। লাক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটি - লাক্ষ্ণৌ, ভারত।
৫। হিন্দু ইউনিভার্সিটি - বেনারস, ভারত।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যা তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের বানানো নিম্নে বর্ণিত দুইটি অপবাদকে ঘিরেই আবর্তমান ঃ

১। তিনি বৃটিশদের দালাল ছিলেন,
২। তিনি মুসলমানদেরকে কাফের ফতোয়া দিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

আমার এ লেখাটি প্রথম অভিযোগটির একটি খন্ডনমূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যা বাস্তবতার আলোকে রচিত। পাঠকবৃন্দ ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণাদি যা প্রকৃত পরিস্থিতিকে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছে, তার আলোকে নিজেরাই বিচার করতে পারবেন অভিযোগের অসত্যতা ও বানোয়াট রূপ সম্পর্কে। দ্বিতীয় অভিযোগটির ক্ষেত্রে বলবো, দৃঢ় ভিত্তি ছাড়া ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) কুফরীর ফতোয়া জারী করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি না, যদিও এ অভিযোগটির খন্ডন আমার এ পুস্তকে বিধৃত হবে না। তিনি কোনো পেশাদার ফতোওয়াবিদ ছিলেন না, মুসলমানদেরকে কুফরীর ফতোয়া প্রদান করতেও তিনি উৎসাহী ছিলেন না। ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) ছিলেন অসাধারণ মেধা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর সময়কার একজন প্রখ্যাত আলেম, দূরদর্শী রাষ্ট্রবিদ এবং প্রশস্ত মনের মুসলমান নেতা ছিলেন। তিনি নজদ রাজ্যের ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন, যে নাকি কেবল মুসলমানদেরকে কুফরীর অপবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, বরং শিরকের দোষারোপ করে তাঁদের রক্তও ঝরিয়েছিল। ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবকে অনুসরণ করে সৈয়দ আহ্মদ

বেরেলভী এবং ইসমাইল দেহেলভীও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (পাকিস্তান)-এ মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়েছিল।

এ অত্যন্ত করুণ ইতিহাস। আমাদের ইতিহাসবিদরা রাজনৈতিক কারণে ঐ সব তথাকথিত সংস্কারকদের হাতে মুসলমান নিধনযজ্ঞের খবর ধামাচাপা দেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য চিরকাল ধামাচাপা থাকে না। বরং তা আজ হোক, কাল হোক প্রকাশিত হয়ে পড়েই। নজদের ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের ভাবশিষ্যদের অনুসারী কতিপয় উলামার বিরুদ্ধে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) ফতোয়া জারী করেন। তবে তাকফিরে মুসলিম বা মুসলমানের প্রতি কুফরী ফতোয়ার এ অভিযোগটি ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং আমি নিশ্চিত যে, কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তি এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে বাস্তব ঘটনাকে এমনভাবে পরিস্ফুট করবেন যার দরুন কেবল আধুনিক পাঠকই এর দ্বারা আকৃষ্ট হবেন না, বরং নিরীহ সাধারণ মুসলমানদেরকে কাফের ফতোয়া দেয়ার অপবাদ থেকেও ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) মুক্ত হবেন।

আমি বর্তমান এ নিবন্ধটি ১৯৮০ইং সালে উর্দু ভাষায় লিখেছিলাম। এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ লাহোর হতে মারকাযে মজলিছে রেযা কর্তৃক তা পুনঃপ্রকাশিত হয় যা এ পুস্তকের প্রারম্ভে দ্বিতীয় তালিকাটিতে দেয়া হয়েছে। ফলে এ পুস্তকের বহু সহস্র কপি বিভিন্ন স্থানে বিতৃত হয়েছে। তথাপিও বুদ্ধিজীবীগণ এ গ্রন্থের ইংরেজী তরজুমার দারুণ অভাব অনুভব করতে লাগলেন, কেননা এতে বিভিন্ন মহাদেশের ইংরেজী শিক্ষিত পন্ডিতদের মাঝে বইটি প্রচারিত, উপলব্ধ ও বিতৃত হতে সক্ষম হবে।

আমার শ্রদ্ধেয় কলেজ অধ্যাপক জনাব আবদুল কাদের, যিনি সিন্ধ প্রদেশের সুক্কুরস্থ গভর্মেন্ট ডিগ্রী কলেজ এন্ড পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ সেন্টারের সাবেক অধ্যক্ষ তিনি এ পুস্তিকাটি অনুবাদ করে দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে ভীষণ ঋণী। এ ছাড়া করাচীস্থ ইমাম আহ্মদ রেযা রিসার্চ ইন্সটিটিউটের সহ-সভাপতি জনাব সৈয়দ ওয়াজাহাত রাসূল কাদেরী, মহাসচিব অধ্যাপক মাজীদউল্লাহ্ কাদেরী ও কোষাধ্যক্ষ জনাব মনযুর হোসেইন জিলানীর সহৃদয় সহযোগিতার জন্যও আমি তাঁদের শোকরিয়া জানাই।

আমি আশা করি যে, সঠিক ইতিহাস জানতে আগ্রহী পাঠককুল ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ এ গ্রন্থটি পাঠ করে জ্ঞানান্বিত হবেন, ইনশা-আল্লাহ্।

ডঃ এম, মাসউদ আহ্মদ

০৩/০৮/৯০ইং

অবতরণিকা

১৯৫৭ইং সাল হতে আমার লেখা লেখি শুরু হলেও ১৯৬৭ইং সালের আগে ইমাম আহ্‌মদ রেযা (রহঃ) সম্পর্কে আমি গবেষণা করতে পারি নি বলে দুঃখিত। এটা এ কারণে যে, আমার পিতা হযরত মুফতী-এ-আ'যম মোহাম্মদ মাযহারউল্লাহ্ ছাড়া আমার সকল শিক্ষকই ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর বিরোধীদের দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ১৯৭০ইং সালে যখন আমি ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের উপর গবেষণা শুরু করলাম, তখনই আমার ভুল ভাঙ্গলো। আমাকে ইতিপূর্বে যা শেখানো হয়েছিল, প্রকৃত ও বাস্তব পরিস্থিতি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। ইমাম আহ্‌মদ রেযা সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক গবেষণা আমার বিস্ময়কে বৃদ্ধি করলো। একটি অনুসন্ধানমূলক পর্যবেক্ষণ হলো সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। বিদ্বেষ প্রসূত প্রচার প্রপাগান্ডা সর্বসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারে সত্য, তবে তা চিরকালের জন্য নয়। যখন সত্যানুসন্ধানী গবেষণা দ্বারা একগুঁয়ে মনোভাবের পর্দা ছিন্ন হয়ে যায়, তখনি আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সঠিক মূল্যায়নের দ্বার উন্মোচিত হয়। ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) সম্পর্কে মানুষেরা যে লিখতে শুরু করেছে, তাই অত্যন্ত পরিতুষ্টির ব্যাপার। বিভিন্ন লেখক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশক ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) সম্পর্কে প্রবন্ধ, ম্যাগাজিন প্রত্রিকা ও পুস্তক আকারে লেখা প্রকাশ করেছেন। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমাম আহ্‌মদ রেযা (রহঃ)-এর উপর গবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে চালু হয়েছে। এম, এ, পরীক্ষার পত্রসমূহে ইমাম আহ্‌মদ রেযা সম্পর্কে প্রশ্নও সাজানো হয়েছে। বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও হযরত ইমাম ছাহেব সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে।

এই বিনীত লেখক গত (৭০-এর) দশকে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখালেখি করেছি, কিন্তু বর্তমানকার বিষয়টি ইতিপূর্বে কখনোই আলোচিত হয় নি। ১৯৭৯ইং সালে ম্যানচেস্টারস্থ (ইংল্যান্ড) মজলিসে রেযা-র সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস আমাকে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের প্রতি বৃটিশ প্রীতির অপবাদ খন্ডনার্থে একটি বিশ্লেষণধর্মী রেসালা প্রণয়নের অনুরোধ করেন। যেহেতু আমি ইমাম আহ্‌মদ রেযা খানের জীবনী গ্রন্থ ("ওয়াসীত" নামের এই গ্রন্থটি শিয়ালকোট হতে মাকতাব-এ-নোমানিয়া প্রকাশ করেছে) সংকলনে ব্যস্ত ছিলাম এবং যেহেতু আমি সাধারণতঃ রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতাম, সেহেতু আমি এ কাজ হাতে নিতে নিজ অপারগতা প্রকাশ করি। ১৯৮০ ইং সালের প্রারম্ভে যখন আমি বইটির

সংকলন সমাপ্ত করি, তখন আমার ম্যানচেস্টারের সেই বন্ধু আমাকে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং সেই বিশ্লেষণধর্মী রেসালা প্রণয়নের পুনঃতাকিদ দিলেন। ১৯৮০-এর নভেম্বর মাসে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান এবং ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ সমাপ্ত করে বর্তমান বিষয়টির প্রতি আমি নযর দেই। এ বিষয়ে লেখার কারণ হলো এই যে, সমাজের শিক্ষিত অংশ ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে এ ভিত্তিহীন দোষারোপ করায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। ভুল বোঝাবুঝি দূরীকরণ ও ইতিহাসবিদ এবং গবেষকদের এড়িয়ে যাওয়া বিষয়টিকে আলোতে আনার জন্য এটা লেখা জরুরী বিবেচনা করা হয়েছিল। আমি শুধু একটি ঘটনা বর্ণনা করছি উপরোক্ত তথ্যকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ আইয়ুব কাদেরী একটি পুস্তকের (খুরশিদ আহ্‌মদ কৃত "পাকিস্তান মে আইন কি তানডিন আওর জামহুরিয়াত কা মাস'আলা, করাচী ১৯৭০ ইং পৃষ্ঠা-১৪) ভূমিকায় ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ও আশরাফ আলী থানবী সম্পর্কে নিম্নের অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ"বৃটিশরা নিজেদের পক্ষে জনমত পরিবর্তন করার জন্য পাল্টা ফতোয়া জারী করিয়ে নেয় ☆। একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এই যে, আশরাফ আলী থানবী ও ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন যদিও ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তবুও তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক ফতোয়া জারী করেন যা বৃটিশের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ কপি বিতরিত হয়" (পাকিস্তান মে আইন কি তাদভিন গ্রন্থের ১৪

☆ জামে' মিল্লিয়া, দিল্লীর ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ জামালউদ্দীন খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে নিজ অপ্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধে এই দুইটি আন্দোলনে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন; কিন্তু তিনি এমন কোনো দালিলিক প্রমাণ তাতে পেশ করতে সক্ষম হন নি যার দরুন প্রমাণিত হয় যে, বৃটিশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুরোধে ইমাম আহ্‌মদ রেযা ফতোয়া জারী করেছিলেন। তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাক যে, ইমাম ছাহেব বৃটিশ সরকারের অনুরোধে ফতোয়া জারী করেছিলেন। একজন মানুষ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দেয় লাভের আশায়। কিন্তু ইতিহাস আমাদেরকে বলছে যে, ইমাম ছাহেব বৃটিশ সরকার হতে কোনো পুরস্কার লাভ করেননি। উপরন্তু এই আন্দোলন চলাকালে তিনি ১৯২১ইং সালে বেহাল প্রাপ্ত হন। এমন কী তাঁর ছেলেদেরকেও ব্রিটিশ সরকার কোনো সুবিধা দেয় নি। এটা আমাদের ইতিহাসে একটা রহস্য যে, যিনি ব্রিটিশদের দালালি করেন নি তাঁকে ব্রিটিশের শুভাকাংক্ষী বলে অপবাদ দেয়া হচ্ছে, পক্ষান্তরে তাঁর শত্রুরা যারা বৃটিশের সাথে আঁতাত করেছিল, তাদেরকে বৃটিশ বিরোধী বলে প্রচার করা হচ্ছে -লেখক।

পৃষ্ঠায় উদ্বৃত অধ্যাপক আইয়ুব কাদেরীর বক্তব্য)।

অপর পক্ষে ডঃ আই, এইচ, কোরেশী বলেছেন যে, থানবী ও বেরেলভী (ইমাম আহ্‌মদ রেযা) গোষ্ঠী মোটেই বৃটিশ প্রীতিগ্রস্ত ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা হিন্দুদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভীষণ শংকিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম নেতৃত্ব পরাধীন হোক, এটা তাঁরা চান নি। তাঁরা এ ব্যাপারেও ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, দ্বীন ইসলামের মুফতীগণ কুরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) -এর হাদীস শরীফ খোঁজ করে বের করতে চেষ্টারত ছিলেন যাতে মহাত্মা গান্ধীর মেনিফেস্টো এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুসৃত নীতিগুলো সমর্থন দেয়া যায় (ইশতিয়াক হোসেইন কোরেশী কৃত ULEMA IN POLITICS-ইংরেজী প্রবন্ধ করাচী ১৯৭২ সাল, পৃষ্ঠা নং - ২৭০)।

এ সকল তথ্যের আলোকে এই বিনীত লেখক নিজ "ফায়েলে বেরেলভী আওর তরকে মাওয়ালাত" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (এর ১ম সংস্করণ লাহোরস্থ মারকাযে মজলিছে রেযা কর্তৃক ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয় এবং এ যাবত বইটির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে) অধ্যাপক আইয়ুব কাদেরীর নেয়া দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা কালে লিখেছিলাম যে অধ্যাপক আইয়ুব কাদেরী একজন পাকিস্তানী লেখক হয়ে এমন অদ্ভুত ধারণা পোষণ করলেন কীভাবে (অধ্যাপক মাসউদ আহ্‌মদ কৃত ফায়েলে বেরেলভী আওর তরকে মাওয়ালাত, লাহোর ১৯৭১ইং, পৃষ্ঠা-৭৫)। এই লেখক পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পদে আসীন এক পুরানো বন্ধুর কাছে বইয়ের একটি কপি পাঠিয়েছিলাম।

এই পুরানো বন্ধুটি আমার বইটি অধ্যয়ন করার পর এমন কতগুলো বিশেষ ধারণা ব্যক্ত করলেন যা ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভ্রান্ত শংকা ও বিভ্রান্তি প্রতিভাত করে। সেগুলো নিম্নরূপঃ "যদিও বইয়ের ৭৫ পৃষ্ঠায় আপনি অধ্যাপক মোহাম্মদ আইয়ুব কাদেরীর উদ্ভট ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন, তথাপিও আপনি এই ওজন সম্পন্ন আপত্তির কোনো প্রত্যুত্তর দেন নি। যদি এই অনুভবযোগ্য দোষারোপ প্রমাণিত হয় যে, ফায়েলে বেরেলভী বৃটিশের সহযোগিতায় অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করেছিলেন, তাহলে তা খোদাতা'লার কাছে একটি মহাপাপ হিসেবেই সাব্যস্ত হবে। কেননা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বৃটিশরা সর্বাধিক বৈরী ভাবাপন্ন ছিল। ইতিহাসের পাতাসমূহ এর সাক্ষ্য বহন করে। অতএব যদি ভারতের জনসাধারণ, যথা-হিন্দু, মুসলমান ও শিখগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোনো রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে শরীয়ত অনুযায়ী হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার শামিল হয় না, যার বিরুদ্ধে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ও মওলভী আশরাফ আলী থানবী এবং অন্যান্য

উলামা কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।

"ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য দলিল দ্বারা এই গুরুতর অভিযোগটি আপনার খন্ডন করা উচিৎ ছিল। ফাযেলে বেরেলভী (ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন)-এর জ্ঞান গভীরতা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নিরপেক্ষতা ও সৎ উদ্দেশ্য প্রমাণিত হলে অধ্যাপক কাদেরীর আনীত অকাট্য যুক্তিভিত্তিক অভিযোগ খন্ডন করা সম্ভব হতো (পত্র তাং ১২ই এপ্রিল, ১৯৭২ইং-করাচী হতে প্রেরিত) ☆

পত্রের অন্যত্র বন্ধুটি লিখেছেন, "একদিকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের যৌথ উদ্যোগকে সমালোচনা করা হয়, অপর দিকে উলামাগণ বৃটিশের ইন্ধনে নিজেদের বিবেককে বিক্রি করে দেন (প্রাগুক্ত পত্র -এবার বিড়াল থলে থেকে বেরিয়ে এসেছে। যে অভিযোগের জন্য যুক্তি ও সাক্ষী চাওয়া হয়েছিল, তা এক্ষণে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে।)

১৯৭৩ ইং সালে এ সকল ধ্যান-ধারনা ব্যক্ত করা হয়েছিল। এই অভিযোগের জবাব প্রকাশ করা হয় নি, কেননা এই বিনীত লেখক ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রতি গুরুত্বারোপ করি না, বরং গঠনমূলক, উদ্ভাবনী ও ইতিবাচক কর্মকাজেকেই পছন্দ করি। সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ সত্যকে গ্রহণ করার পরিবর্তে সর্বদা নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে নতুন নতুন যুক্তি খাড়া করতে ব্যস্ত। তিনি তাঁর গৃহীত অবস্থানের পক্ষে বহু যুক্তি পেশ করে তা প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর। সৎ মত পার্থক্যকে শ্রদ্ধা ও সহ্য করা উচিৎ, কিন্তু এমন কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা বন্ধুত্বকে অবজ্ঞা করেন এবং নিজেদের প্রতিপক্ষের তুমুল বিরোধিতা করেন ☆☆। ঐতিহাসিক তথ্যাদি যেন ধর্মীয় বিশ্বাসের সমতুল্য-

☆ পত্রের প্রকৃতিই হলো বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে। ফরিয়াদীকে প্রামাণ্য দলিল পেশ করা হতে মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং বিবাদীকে সাক্ষী পেশ করার জন্য চাপ দেয়া হয়েছে। এক দিকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হচ্ছে যে বৃটিশদের ইন্ধনে ফতোয়া জারী করা হয়েছিল অপর দিকে নিরাবপ্ল দেখা হচ্ছে যে এই অভিযোগটি অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর সবই প্রপাগান্ডা ছাড়া কিছু নয়। -অধ্যাপক মাসউদ আহ্‌মদ।

☆☆ এই লেখকও অনুরূপ এক পরিস্থিতির সম্মুখীন। পি,এইচ, ডি, ডিগ্রীধারী এক পুরানো বন্ধু আমার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন এ কারণে যে, কেন আমি ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের উপর গবেষণা কর্ম করছি। তিনি তাঁর এক পত্রে লিখেছেন, "আপনি কি আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাড়া আর অন্য কোনো বিষয়ে লেখার যোগ্যতা ধারণ করেন না?" (পত্র-তাং ২৬/১২/১৯৮০ইং ইসলামাবাদ)। মনে হয় সমালোচক বন্ধুটি জানেন না যে বিগত ২৪ বছরে এই লেখক শতাধিক বিষয়ে লিখেছি। -অধ্যাপক ডঃ মাসউদ আহ্‌মদ।

কেউ এর বিরোধিতা করলেই যেন তাকে কতল্ করতে হবে আর কী! এই লেখক ঐতিহাসিক তথ্যাদি ও ধর্মীয় মতবাদকে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করতে দৃঢ় বিশ্বাসী। মত পার্থক্যের ক্ষেত্রে যুক্তির মাধ্যমে কারো বোধোদয় ঘটানো যায়। তবে শর্ত থাকবে এই যে, ইতিহাসকে তার যথাযথ রূপে অধ্যয়ন করতে হবে। যদি মতপার্থক্যটুকু একটি মতবাদের মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং যদি প্রতি পক্ষ এই অবস্থান নেন যে তাঁর মতবাদই সঠিক, তাহলে পরিস্থিতির অবনতি হবে এবং পরস্পর দোষারোপের দরুণ তা ঝগড়া ফাসাদের রূপ পরিগ্রহ করবে।

সুতরাং এই বিনীত লেখক ইতিবাচক গবেষণায় আত্ম নিয়োগ করেছি, যদিও কতিপয় সমালোচক তা অপছন্দ করছেন। আমার স্বাভাবিক মানসিকতার কারণে আমি ১৯৭৩ ইং সাল হতে বর্তমান সময় অবধি ইমাম আহ্মদ রেযা খানের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগের খন্ডনে কিছু লেখি নি। কিন্তু তবুও কতিপয় বুদ্ধিজীবী কর্তৃক ঐ অসুস্থ অপবাদ প্রদান অব্যাহত থাকে। তাই আমাকে এই নিন্দনীয় অপবাদ প্রদানের বিষয়ে কলম ধরতে হয়েছে।

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের শত্রুদেরকে খন্ডন করার জন্য এগুলো লেখা হয় নি, কেননা বিরোধিতা যখন একগুঁয়ে মতবাদের রূপ ধারণ করে, তখন তাকে শুধুরানো যায় না। একমাত্র খোদাতা'লা প্রদত্ত হেদায়াতই সঠিক রাস্তা দেখাতে সক্ষম। এখানে যা কিছু লেখা হয়েছে তা শুধু প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু সমালোচক ও সঠিক ইতিহাসের রূপ অন্বেষী তরুণ সম্প্রদায়ের জন্যই লেখা হয়েছে। আমি আশা করি, এই বইটি সত্য প্রেমিকদেরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সত্য গ্রহণ করার এবং সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর নেয়ামত বর্ষণ করুন, আমীন।

-অধ্যাপক ডঃ এম, মাসউদ আহ্মদ
অধ্যক্ষ,
সরকারী ডিগ্রী কলেজ ও
পোষ্ট গ্রাজুয়েট ষ্টাডিজ সেন্টার,
সুক্কুর, সিন্ধ, পাকিস্তান।
তাং - ৩০শে মুহররম ১৪০১হিঃ
৯ই ডিসেম্বর ১৯৮০ইং

সূচীপত্র

সূর্যোদয়

১৯পৃষ্ঠা
(১) ধর্ম ও সমাজ
☆ ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের যৌবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া।
☆ ইউরোপীয় নারীদের বিয়ে করা হতে বিরত থাকা।
☆ ইংরেজদের দ্বারা হত জন্তুর গোস্ত খাওয়া হতে বিরত থাকা।
☆ কুরআন মজীদ সম্পর্কে এক খ্রীষ্টান পাদ্রীর আপত্তি এবং ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের প্রত্যুত্তর।

২৫ পৃষ্ঠা
(২) সরকার ও বিচার বিভাগ
☆ বৃটিশের সাথে শরিয়ত বিরোধী চুক্তির বিরুদ্ধে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন।
☆ বৃটিশ শাসনের প্রতি ঘৃণা।
☆ মাওলানা মঈনউদ্দীন আজমেরীর সাক্ষ্য।
☆ রাণী ভিকটোরিয়া, রাজা এডওয়ার্ড-৭ এবং জর্জ-৫ প্রমুখের ছবির প্রতি ঘৃণা।
☆ ইংরেজ আইন-আদালতের প্রতি ঘৃণা।

৩১ পৃষ্ঠা
(৩) শিক্ষা ও সংস্কৃতি
☆ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ঘৃণা।
☆ ইংরেজ সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা।
☆ ইংরেজ সংস্কৃতির প্রতি মাওলানা হামেদ রেযা খাঁন (ইমাম ছাহেবের পুত্র) -এর কঠোর সমালোচনা।

৩৪ পৃষ্ঠা
(৪) চিন্তা-চেতনা ও সমালোচনা
☆ নিউটনের উপর সমালোচনা।
☆ এলবার্ট আইনষ্টাইনের উপর সমালোচনা।
☆ এলবার্ট এফ পোর্টার উপর সমালোচনা

৩৫ পৃষ্ঠা
(৫) খৃষ্টানদের সমর্থক, অনুসারী ও প্রেমিক গং
☆ মীর্জা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের পুস্তিকা।
☆ ইমাম ছাহেবের ভাই মাওলানা হাসান রেযার পুস্তিকা।
☆ ইমাম ছাহেবের পুত্র মাওলানা হামেদ রেযার পুস্তিকা।

☆ খত্মে নবুয়্যত আন্দোলনে ইমাম ছাহেবের অনুসারীদের ভূমিকা।
☆ স্যার সৈয়দ আহ্মদ খাঁনের উপর সমালোচনা।
☆ নদওয়াতুল উলামার উপর সমালোচনা।

(৬) ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক বন্ধন ৪০ পৃষ্ঠা
☆ বৃটিশের চেহারার প্রতি ঘৃণা।
☆ স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর মুজাহিদ ভ্রাতা মাওলানা আব্দুল কাদের বদাইউনী প্রীতি।
☆ স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত মাওলানা কেফায়েত আলী কাফী প্রীতি।

(৭) অপবাদ ও তার কারণসমূহ ৪১ পৃষ্ঠা
☆ ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন ও খেলাফত আন্দোলন।
☆ ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন ও অসহযোগ আন্দোলন।
☆ হিন্দু আধিপত্যবাদের প্রতি ইমাম ছাহেবের ঘৃণা।

(৮) জবাব ও জবাবের সমর্থন ৪৯ পৃষ্ঠা
☆ ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের ঐতিহাসিক জবাব।
☆ ফুলওয়ারী শরীফের মোহাম্মদ জাফর শাহের প্রমাণ।

(৯) তথ্যাবলী ও সাক্ষ্যসমূহ ৫০ পৃষ্ঠা
(১০) ৩য় সংস্করণের সাথে সংযুক্ত অংশ ৫৭ পৃষ্ঠা

সূর্যোদয়

খৃষ্টান সম্প্রদায়, খৃষ্টান ধ্যান-ধারনা ও খৃষ্টান সভ্যতা সম্পর্কে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের দৃষ্টি ভঙ্গি ও সমালোচনা এবং তার সমসাময়িক ব্যক্তিত্বদের দ্বারা তার সমর্থন।

(১)

কৌশলগত বাস্তবতা অনুসারে খৃষ্টানরা আসলেই মুশরিক (মূর্তি পূজারী), কেননা তাঁরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী এবং নবুয়্যতে অবিশ্বাসী। (ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন কৃত আ'লম বি আন্না হিন্দুস্তান দার আল্ ইসলাম ১৩০৬ হিজরী/১৯৮৮ ইং, বেরেলীতে প্রকাশিত ১৩৪৫ হিজরী ১৯২৭ ইং সাল, পৃষ্ঠা-৯)

(২)

ওয়াল্লাহ্! এই জাতি (বৃটিশ) কৃত অযৌক্তিক ও আবেগপ্রবণ! এটা সত্যি দুঃখজনক যে, এই জাতি খোদাদ্রোহী হওয়ার মত ঔদ্ধত্য ভাব পোষণ করছে। আর মুসলমানগণও

তাদের আবর্জনাময় মতবাদ বহন করছেন এই বলে যে, "নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র কাছ হতে এবং নিশ্চয় তাঁর কাছেই আমরা প্রত্যাবর্তন করবো।

(ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন প্রণীত আল্ সাম্সাম আলা মোশাক্কাক ফি আয়াতে উলুম আল্ আরহাম; ১৩১৫ হিজরী-১৮৯৭ ইং সালে লিখিত এবং লাহোরে প্রকাশিত; পৃষ্ঠা-১৯/২০ দ্রষ্টব্য)

(৩)

ইংরেজী ও অন্যান্য ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা দুনিয়াবী কিংবা দ্বীনী ক্ষেত্রে উপকারী নয়। এ সকল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে মুসলমান ছাত্রদেরকে অযৌক্তিক বিষয়াদিতে লিপ্ত রাখতে যাতে করে তাদেরকে ধর্ম সম্পর্কে অনবধান ও ধর্ম সচেতনতা বর্জিত রাখা যায়। তারা আর জানতে পারবে না তারা কারা এবং তাদের জাতিয়তাই বা কী।

(ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন রচিত আল্ মোহাজ্জাত আল্ মোতামিনা ফি আয়াত আল মোমতাহিনা; ১৩৩৯ হিজরী-১৯২১ ইং সালে লিখিত; লাহোরে প্রকাশিত ১৩৯৬ হিজরী-১৯৭৬ ইং; পৃষ্ঠা-৯৩)

(৪)

ইউরোপীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ সকল লেবাসে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহ্রিমা যা প্রায় হারাম। যদি কেউ ইসলামী পোষাকে নামায না পড়ে, তবে সে পাপী হবে এবং সে খোদাত'লার শাস্তিযোগ্যও হবে। আল্লাহ্ মাফ করুন, যিনি সর্বশক্তিমান ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

(ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন লিখিত আল্ আতায়া আল্ নববীয়া ফিল্ ফাতাওয়া আল্ রাযাভীয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪২, লাইলপুরে প্রকাশিত)

(৫)

ইংরেজ রীতি ও ফ্যাশন থেকে এবং নাস্তিকতা ও 'মুক্ত চিন্তা' থেকে মুক্তি প্রাপ্তি আত্মিক প্রশান্তির কারণ। আল্লাহ্ আমাদের হেদায়াত দিন। কিন্তু এগুলো অর্জনের জন্য শুধু মাত্র সাহায্য প্রত্যাখ্যান কিংবা সংশ্লিষ্টতা নাকচ করলেই চলবে না, বরং সৈয়দ আহ্মদ খাঁন যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন তাকে নির্বাপন করতে হবে। এখনো বহু লোক এর দ্বারা আক্রান্ত দেখা যাচ্ছে।

(ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন কৃত আল্ মোহাজ্জাত আল মোতামিনা ফি আয়াত আল্

মোমতাহিনা, লাহোরে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৯৩)

(৬)

"অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে থাকাকালীন সময়ে আমি ফাযেলে বেরেলভীর (ইমাম ছাহেবের) ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম না। অসহযোগ আন্দোলন মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল যে, তিনি বৃটিশের বেতনভুক দালাল ছিলেন, আর তাই অসহযোগের বিরোধী ছিলেন। বস্তুতঃ একজন ব্যক্তিকে অপদস্থ ও হেয় করার জন্য কিছু চটকদার কথা বেছে নেয়া হয়ে থাকে। আমি আমার জীবনে এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।"

(অসহযোগ আন্দোলনের সদস্য মোহাম্মদ জাফর ফুলওয়ারভী সাহেবের উদ্ধৃতি; মোহাম্মদ মুরীদ আহমদ চিশতী প্রণীত মুহিব্বানে রেযা গ্রন্থ সূত্রে প্রাপ্ত; লাহোরে প্রকাশিত ১৯৮১ সালে; পৃষ্ঠা-১২৫)

(৭)

"রাজনৈতিকভাবে বলা যায় যে হযরত মওলানা আহমদ রেযা খাঁন একজন স্বাধীনতা প্রেমিক ছিলেন। তিনি ইংরেজদের এবং বৃটিশ সরকারকে ঘৃণা করতেন। তিনি নিজে এবং তাঁর পুত্রগণ যথা মাওলানা হামিদ রেযা ও মোস্তাফা রেযা খাঁন কখনোই 'শামসুল উলামা' জাতীয় খেতাবের পিছু ধাওয়া করেন নি। তাঁরা শাসক ও সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে চিরকাল নির্লিপ্ত ছিলেন।

(ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের সমসাময়িক সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলীর উক্তি; যিনি অল্ পাকিস্তান এডুকেশনাল কনফারেন্স করাচী-এর সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন; সূত্র ঃ দৈনিক জঙ্গ, করাচী; তাং-২৫ শে জানুয়ারী ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত; পৃষ্ঠা-৬, কলাম-৪/৫)

(৮)

(আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি মিথ্যুকদের উপর পতিত হোক)। যে কেউ তা করে (মিথ্যাচার সংঘটন করে), সে আল্লাহ্ পাকের, তাঁর প্রিয় রাসূল (দঃ)-এর এবং তাঁর আউলিয়ায়ে কেরামের অসন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয়ে কেয়ামত অবধি দুর্ভোগ পোহাবে।

(ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ছাহেবের উক্তি; সূত্র ঃ মাসিক আল্ সাওয়াদ আল্ আযম, মোরাদাবাদ; জমাদিউল আউয়াল সংখ্যা ১৩৩৯ হিজরী-১৯২০ ইং, পৃষ্ঠা-৩০)

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন রহঃ -এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব

৭৮৬/৯২

যখন কেউ একটি জাতিকে ভালবাসেন, তখন তিনি সেই জাতির সমস্ত কিছুকেই ভালবাসেন; অর্থাৎ সেই জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজ্য, আইন, শিক্ষা ব্যবস্থা, সভ্যতা, খান-দানা, দর্শন, আশ্রয়াধীন মানুষ, অনুসারীবৃন্দ, সাহায্যকারীগণ, প্রেমিক মন্ডলী, চরিত্র বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সব কিছুকেই তিনি ভালবাসেন।

এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন বৃটিশদের ভালবাসতেন এবং তাদের আজ্ঞা পালন করতেন। কিন্তু কাছে থেকে তদন্ত করার পর উদঘাটিত হলো যে, প্রকৃত পক্ষে এ রকম কোনো ঘটনাই ঘটে নি।

অপবাদ প্রদানকারীরাই বরং বৃটিশদের দালাল হিসেবে প্রমাণিত হলো এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিটি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। আর এখানেই বিস্ময়ের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে পরখ করা হয়েছে, কিন্তু বৃটিশের প্রতি ভালবাসার কোনো প্রমাণই মেলে নি।

আসুন, আমরা এবার সত্য আড়ালকারী পর্দা উঠিয়ে নেই। অতঃপর সত্যকে অবলোকন করি। আসুন, আমরা সময়ের অন্ধকার গলিপথে আমাদের মস্তিককে আচ্ছন্নকারী সন্দেহ ও শংকাকে দূরীভূত করি যা এতদিন আমাদের দৃষ্টি শক্তি ও বিবেককে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

ধর্ম ও সমাজ

সংস্কৃতিগতভাবে খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিয়ে এবং খ্রীষ্টানদের দ্বারা হত পশু পাখি হালাল তথা অনুমতি প্রাপ্ত ঘোষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বৃটিশদের দালাল একজন আলেমের কাছে এটাই আশা করা যায় যে তিনি ইসলামী শরীয়তের এ আদেশটি বৃটিশদের জন্য বহাল করবেন। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি আলা হযরত ইমাম আহ্মদ রেযা খানের জন্য ভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়েছে।

১২৯৮ হিজরী/১৮৮৮ ইং সালে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন যখন মাত্র ২৪ বছর বয়স্ক ছিলেন, তখন বদায়ূনের জনৈক মীর্যা আলী বেগ তাঁর কাছে তিনটি সওয়াল সম্বলিত একটি পত্র পেশ করেন ঃ

১। ভারত দারুল হরব্ নাকি দারুল ইসলাম। (ইমাম আহ্মদ রেযা কৃত আল্ আ'লম বিয়ান্না হিন্দুস্তান দার আল্ ইসলাম, বেরেলীতে প্রকাশিত ১৩৪৫ হিজরী-১৯২৭ ইং

সালে; পৃষ্ঠা-৯/২)।

২। ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায় কি আহ্‌লে কেতাব না মুশরিক। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯-১৫)

৩। রাওয়াফিয (শিয়া) ও তাদের অনুসারীরা মুরতাদ্দ কিনা। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫/২৩)।

প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন বলেছেন যে, ভারত দারুল ইসলাম, কেননা দারুল হরব হলো এমনি একটি দেশ যেখানে ইসলামী আইন ও বিধান জারী করা অসম্ভব। যেহেতু সেই ধরনের পরিস্থিতি ভারতে বিরাজমান নেই, সেহেতু এটা দারুল ইসলাম। এ ফতোয়াটি একেবারেই বিচার বিভাগীয়; এটা মোটেই রাজনৈতিক নয়। এ জবাবটিতে এমন কোনো বাক্য নেই যা থেকে প্রতিভাত হয় যে ফতোয়াটি বৃটিশদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য দেয়া হয়েছিল। তবে সেই যুগে বৃটিশের বহু বিরোধিতাকারী ছিলেন, যাঁরা ইতিপূর্বে বৃটিশের অনুগত ছিলেন। (স্যার আলফ্রেড লায়ল লিখেছেন যে, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সকল মহলের লোকেরাই "বৃটিশ রাজ মুকুটের প্রতি অনুগত থাকার ব্যাপারে একমত ছিলেন"-স্যার লায়ল প্রণীত হিন্দী মামলুকাত কা উরুজে যাওয়াল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য; হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণাত্য হতে প্রকাশিত, ১৯৩২ ইং)।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির প্রতি ইমাম সাহেবের উত্তরই আমাদের অবস্থানকে সমর্থন যোগায়। বস্তুতঃ কতিপয় উলামা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ভারতকে দারুল হরব্ ঘোষিত হতে দেখতে চেয়েছিলেন, যাতে ভারতে সুদ গ্রহণ অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে যায়। কেননা দারুল হরব্-এর একজন অধিবাসীর কাছ থেকেই কেবলমাত্র সুদ গ্রহণ করা কারো পক্ষে বৈধ বা অনুমতিপ্রাপ্ত। ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন এর প্রত্যুত্তরে ঐ ধরনের ব্যক্তিবর্গের কঠোর সমালোচনা করেন এবং লিখেন যে তাঁরা ভারতকে দারুল হরব্ ঘোষণা করে সুদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেও তাঁরা হিজরত করতে প্রস্তুত নন যা দারুল হরব্-এর ক্ষেত্রে করা বাধ্যতামূলক। ফলে ইমাম ছাহেবের প্রত্যুত্তরটি সুদ না গ্রহণ করার একটি শরয়ী সিদ্ধান্ত বলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। এটা কাউকে খুশী করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় নি। ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) -এর সাথে মওলবী আশরাফ আলী থানবী[১৮] এ

[১৮] আশরাফ আলী থানবী কৃত তাহ্‌যির আল্ এখওয়ান আনির রেবা ফিল হিন্দুস্থান; থানা ভবনে প্রকাশিত, ১৩৩২ হিজরী-১৯০৫ ইং।

জরুরী নোট ঃ মওলবী কাসেম নানাতুবীও ভারতকে দারুল হরব্ ঘোষণা করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন (কাসেম আল উলুম -এর পত্র; লাহোরে প্রকাশিত ১৯৭৪ ইং, পৃষ্ঠা-৩৬৪)। মওলবী নাযের হোসেইন ভারতকে দারুল আমান ঘোষণা করেছিলেন (ফযল হোসেইন বিহারী কৃত আল হায়াত বাদ আল্ মামাত, করাচীতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১৩৪)। মওলবী আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী একটি ফতোয়ায় ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারত দারুল হরব নয় (মজমুয়ায়ে ফতোয়া, লক্ষ্ণৌতে প্রকাশিত ১৩৪০ হিজরী/১৯২২ ইং, পৃষ্ঠা-৩২০)।

ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে যা বলেছেন, তাই আমাদের মনযোগ আকর্ষণের দাবীদার। এটা সকল সন্দেহ দূর করে দিয়েছে। ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন বলেন, "খ্রীষ্টানরা মুশরিক, কেননা তাঁরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। অনুরূপভাবে, যে সকল ইহুদী এযরা নবী (আঃ)-কে খোদার পুত্র মনে করেন, তাঁরাও মুশরিক"। (আল আ'লম বিয়ান্না হিন্দুস্তান দার আল্ ইসলাম, পৃষ্ঠা-৯)।

অতঃপর ইমাম আহ্‌মদ রেযা লিখেন ঃ "এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হলো এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে (কুরআন পাকে) তাঁরই প্রদত্ত বিধানাবলী পৃথকভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং তাদের নারীদেরকে ও তাদের দ্বারা হত পশু-পাখিদেরকে মুসলমানদের জন্য হালাল বা বৈধ ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কুরআন মজীদে উদ্ধৃত আহলে কেতাব বা ঐশী গ্রন্থ সম্পন্ন মানুষদের মৌলিক শ্রেণীতে যীশু খ্রীষ্টকে খোদা জ্ঞানকারী বর্তমানকালের খ্রীষ্টান ও এযরাকে খোদার পুত্র জ্ঞানকারী ইহুদী লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কিনা। নাকি তাদেরকে মুশরিকদের শ্রেণীভুক্ত করতে হবে এবং তাদের নারী ও হত জন্তু-জানোয়ার মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ করতে হবে? (প্রাগুক্ত আল্ আ'লম, পৃষ্ঠা-৯/১০)।

এ প্রশ্নটি উত্থাপন করে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) উলামাদের মত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কতিপয় উলামা এ ধরনের ইহুদী ও খ্রীষ্টানকে আহ্‌লে কেতাবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন; অপর পক্ষে কতিপয় উলামা তাদেরকে মূর্তিপূজারী মুশরিকদের পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

যদি ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন বৃটিশ প্রেমিক হতেন, তাহলে তিনি উলামাগণের এই মতপার্থক্যের পূর্ণ ফায়দা উসুল করতেন এবং বৃটিশদেরকে আহ্‌লে কেতাব ঘোষণা করে দিতেন। কিন্তু মহা নৈতিক সৎসাহস ও সতর্কতা সহকারে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এমনই এক সময়ে যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে কথা বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। তিনি স্বদেশী কিংবা বিদেশীদের পরোয়া করেন নি, বরং সর্বদা শরীয়তের আইনের মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন। আর এটাই হলো একজন সত্যপন্থী ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির পার্থক্যকারী গুণ। ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন বৃটিশদের সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত পেশ করেনঃ

"যখন উলামায়ে কেরামের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে এবং এ বিষয়ে একটি ফতোয়া জারী করা হয়েছে, তখন খ্রীষ্টানদের দ্বারা হত জন্তু না খাওয়া এবং তাদের নারীদেরকে গ্রহণ না করাই উত্তম। যদি বর্তমানকালেও হযরত উযাইর (আঃ)-কে

খোদার পুত্র জ্ঞানকারী ইহুদীরা বিরাজ করে, তাহলে তাদের দ্বারা হত জন্তু জানোয়ার এবং তাদের নারীদের পাণি গ্রহণ করাও আমাদের উচিৎ হবে না। এমন কী যদি ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা আহ্‌লে কেতাব-ও হয় তথাপিও তাদের নারীদের বিয়ে এবং তাদের দ্বারা হত জন্তুর গোস্ত ভক্ষণ করাতে আমাদের জন্য কোনো লাভ নেই। শরীয়তে এটা বাধ্যতামূলক করা হয় নি, আমাদের কাছেও এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। তারা আহ্‌লে কেতাব হলেও আমাদের বিরত থাকা উচিৎ। আর যদি উলামাগণের গৃহীত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হয়, তবে ইহুদী খৃষ্টানদের নারীদের বিয়ে করাটা নির্ঘাত যেনা হবে এবং তাদের দ্বারা হত পশু-পাখিও নিষিদ্ধ হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করুন ! একজন ব্যক্তির উচিৎ নয় এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া যা একদিকে অনভিপ্রেত এবং অপর দিকে একেবারেই নিষিদ্ধ।"(ইমাম আহ্‌মদ রেযা কৃত আল্ আ'লম, পৃষ্ঠা-১৪)।

এ সকল উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) প্রথম থেকেই ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে অসহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আবেগের পরিবর্তে বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ মর্মে জোর দিয়েছিলেন যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কারোরই শরীয়তের সীমা লংঘন করা উচিৎ নয় এবং তাই ভারতের মূর্তি পূজারী মুশরিক তথা হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করা উচিৎ নয়। খ্রীষ্টানদের দ্বারা ইসলামের মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং কুরআন-হাদীস সম্পর্কে তাঁদের উত্থাপিত আপত্তি ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন কখনোই বরদাস্ত করতেন না, বরং তিনি সর্বদা শরীয়তকে আঁকড়ে ধরতেই পছন্দ করতেন। একবার এক খ্রীষ্টান পুরোহিত অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আল্ কুরআনে বিবৃত হয়েছে একজন নারীর গর্ভের সন্তানটি ছেলে না মেয়ে তা কেউই জানে না; অথচ বর্তমানে তা বলে দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রষ্টান পুরোহিতের এ আপত্তিটি পাটনার জনাব কাজী আবদুল ওয়াহেদ ইমাম ছাহেবের কাছে প্রশ্নাকারে প্রেরণ করেন ১৩১৫ হিজরী/ ১৮৯৭ ইং সালে। এর প্রত্যুত্তরে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব ১৩১৫ হিজরী/১৮৯৭ ইং সালেই "আল্ সাম সাম আলা মোশাক্কাক ফি আয়াতে উলুম আল্ আরহাম" নামক একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থটিতে তিনি সমস্যাটির সকল দিক নিয়ে আলোকপাত করেন এবং অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করেন। পরিশেষে খ্রীষ্টানদের অযৌক্তিক মতবাদকে সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন ঃ

" বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা সর্ব শক্তিমান খোদাতা'লা যিনি সর্বদর্শী, সর্বত্র বিদ্যমান এবং মহা পরাক্রমশালী, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী এ পথভ্রষ্ট জাতির

জন্য নিন্দাবাদ।"

দয়া করে ইনসাফ করুন! খ্রীষ্টানরা হলেন অযৌক্তিক, অধার্মিক ও দোযখের ইন্ধন; তাঁরা এক এবং তিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে অক্ষম; তাঁরা ত্রিত্বে বিশ্বাসী, আবার একত্বেও বিশ্বাসী। তাঁরা খোদা তা'লার প্রতি একটি স্ত্রী ও পুত্র আরোপ করেছেন, অথচ খোদাতা'লা এ সকল শয়তানী ধ্যান ধারনার বহু উর্ধ্বে। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কুমারী মরিয়মের একজন স্বামী অর্থাৎ সূত্রধর যোসেফ নামের এক ব্যক্তির অস্তিত্ব বানিয়ে নিয়েছেন। যোসেফের জীবদ্দশায়ই যখন মরিয়ম হযরত যীশু খ্রীষ্টের জন্ম দেন, তখনই খ্রীষ্টানরা তাঁকে খোদার পুত্র বলে ঘোষণা করেন। খোদার পুত্র খোদা ঘোষণা করার পরে তাঁরা তাঁকে কাফেরদের হাতে ক্রুশবিদ্ধ করার গল্প ফাঁদেন। তাঁরা হযরত ঈসা (আঃ) –এর রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত। তাঁরা রুটি ভক্ষন করেন যীশু খ্রীষ্টের গোস্ত মনে করে; তাঁরা মদ্য পান করেন যীশুর রক্ত মনে করে। এটা সত্যি আশ্চর্যজনক যে, তাঁদের খোদা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং দোযখে গমন করেছিলেন। মহা প্রভু খোদা তা'লার উপস্থিতিতে ক্রুশবিদ্ধকরণ একেবারেই অবান্তর! নিষ্পাপ নবী (আঃ) গণের প্রতিও খ্রীষ্টানরা উদ্ভট দোষারোপ করেছেন। তাঁরা দুরভিসন্ধিমূলক কল্পনাসমূহকে ঐশী প্রেরণার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়েছেন (ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন কৃত আল্ সাম সাম আলা মোশাক্কাক ফি আয়াতে উলুম আল্ আরহাম, লাহোরে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১৯/২০)।

" এটা সত্যি দুঃখজনক যে, আল্লাহ্ তা'লার সৃজনশীল অঙ্গীকারগুলোকে অযৌক্তিক ও আবেগপ্রবণ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন এবং মুসলমানগণ তাঁদের শয়তানী কথাবার্তা মুখ বুজে সইছেন এ কথা বলে যে, আমরা আল্লাহ্ হতে এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবো" (প্রাগুক্ত)।

বৃটিশদেরকে ভালবাসলে এভাবে কঠোর সমালোচনা করা যেতো না। তাঁদের বিশ্বাসকে এত সহনকারী সমালোচনায় জর্জরিত করাও সম্ভব হতো না।

জাতিয়তাবাদী উলামা বৃন্দ ও মুসলমান পন্ডিতবর্গ হিন্দুদের সাথে দৃঢ় রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তাই তাঁরা হিন্দুদেরকে তাঁদের মুসলমান প্রতিপক্ষের তুলনায় বেশী গুণকীর্তন করেছিলেন। আপনারা ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক মুসলমান পন্ডিতদের গবেষণাকর্মে এ ধরনের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন, কিন্তু ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব তাঁর গ্রন্থাবলীতে কখনোই অমুসলমান ব্যক্তিত্বদেরকে বে-হুদা প্রশংসা করেন নি।

ইসলামী শরীয়ত বিরোধী বৃটিশদের বিচার বিভাগীয় রায় ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন মাথা পেতে মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কানপুরের মাছুলি বাজার মসজিদের ঘটনাটি এ ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার রাস্তা

সম্প্রসারণের সময় উল্লেখিত মসজিদটির কিছু অংশকে উদ্দেশ্য মূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং তাঁরা প্রতিবাদ করেন। বৃটিশ সরকার মুসলমানদের উপর গুলি বর্ষণ করেন এবং বহু মানুষকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। অবশেষে ১৬ ই আগষ্ট ১৯১৩ ইং সালে বিশিষ্ট মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মওলানা আব্দুল বারী ফারাংগী মহলী, রাজা সাহেব মাহমুদ আবাদ এবং স্যার রেযা আলী-তাঁরা উত্তর প্রদেশের গভর্ণরের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ১৪ ই অক্টোবর ১৯১৩ ইং তারিখে এ সকল প্রতিনিধি কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে মুসলমান জাতির পক্ষে ভারতের ভাইসরয়ের সাথে বিষয়টির মীমাংসা করেন। উল্লেখিত শর্তাবলীর মধ্যে নিম্নের শর্তটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

" যেহেতু মসজিদের সাধারণ উচ্চতা রাস্তার উচ্চতা হতে কয়েক ফুট উপরে, সেহেতু বাথরুমগুলো তাদের পূর্বেকার স্থানে পুনঃনির্মাণ করা হবে। কিন্তু নিচু ভূমিতে ফুটপাথ নির্মাণ করা হবে, যাতে করে পথচারীরা পার হতে পারেন।" (স্যার রেযা আলী কৃত আমল নামা, দিল্লীতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৩২৫)।

যখন মাওলানা সালামত উল্লাহ্ সাহেব (সহ-সভাপতি, মজলিছে মুইন-উল-ইসলাম, ফারাংগী মহল, লক্ষ্ণৌ) এ চুক্তিটি সম্পর্কে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) –এর কাছে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তখন ইমাম ছাহেব পত্র মারফত কিছু কিছু বিষয়ের বৃত্তান্ত খোলাসাভাবে জানার জন্য লিখে পাঠান, যাতে করে কোনো কিছু গোপন না থাকে। সকল তথ্যের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণের পরে একটি ফতোয়া জারী করা হয় যার মধ্যে ইমাম ছাহেব বৃটিশ সরকার কিংবা তাঁর বন্ধু মাওলানা আবদুল বারী ফারাংগী মহলীকে কোনো রকম ক্ষমা প্রদর্শন করেন নি।

বৃটিশদের প্রতি ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু তাঁর বন্ধুর প্রতি তাঁর দয়াশীল হওয়ার কথা ছিল। অথচ তিনি তার ধার না ধেরে নিজ সিদ্ধান্ত দিলেন ঃ

" আমি কিছু কাল অপেক্ষা করেছি। আমি এ তৎপরতার সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে খবরের কাগজগুলোও পাঠ করেছি। কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া যায় নি। তাই আমার সিদ্ধান্ত বন্ধুবর্গের বিরুদ্ধেই দেয়া হলো, কেননা সত্যকে তুলে ধরা অত্যাবশ্যক। মাওলানা আব্দুল বারীর সাথে আমার পূর্বেকার বন্ধুত্ব আমার অবস্থানকে পরিবর্তন করতে অক্ষম।" (ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন কৃত এবানাতুল মাতভারী ফি মাসালাহত্ আবদ্ আল্ বারী, বেরেলীতে প্রকাশিত ১৩৩১ হিজরী ১৯১৩ ইং। বিঃ দ্রঃ এ বইটির একটি কপি আমার কাছে আছে, প্রথম সংস্করণ – লেখক)

যেহেতু ইসলামে ওয়াক্ফ সম্পত্তি ক্ষতিপূরণসহ কিংবা ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে হস্তান্তর

অযোগ্য, সেহেতু ইমাম ছাহেব বৃটিশ অথবা তাঁর বন্ধুর কারুরই তোয়াক্কা করেন নি।

সরকার ও বিচার বিভাগ

বৃটিশ বিচারালয় সম্পর্কে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন অত্যন্ত বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি বৃটিশ বিচার বিভাগের কাছে শরণাপন্ন হওয়াকে ইসলামী ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ধ্বংসাত্মক বিবেচনা করতেন। ১৩৩১ হিজরী/১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতির জন্য ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) কিছু পরামর্শ পেশ করেন। তিনি তাঁর প্রথম পরামর্শটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিশেষ কিছু বিষয় ছাড়া মুসলমানগণ যদি নিজেদের বিভেদগুলো নিজেরাই সমাধান করতেন এবং বৃটিশ বিচারালয়ে মোকদ্দমা করে কোটি কোটি টাকা অপচয় করা হতে বিরত থাকতেন, তাহলে তাঁরা অসংখ্য পরিবারের ধ্বংস সাধন বন্ধ করতে সক্ষম হতেন।" (আহ্মদ রেযা খাঁন কৃত তদবীর এ ফালাহ্ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ্, ১৩৩১ হিজরী ১৯১২ খৃষ্টাব্দ, লাহোরে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৫)।

গ্রন্থের অন্যত্র ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন ছাহেব এ ব্যাপারে মুসলমানদের অবহেলাকে নিন্দা করেন। প্রথমতঃ একটি ঘরোয়া মীমাংসা যা কোনো ব্যক্তির দাবীকে কোনো ক্রমেই বিচ্যুত করে না, তা ঐ ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু মামলা চলাকালে সমস্ত সম্পত্তি যদি খোয়া যায়ও, তথাপিও তা সর্বান্তকরণে গ্রহণযোগ্য। আপনারা কি এ পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে সক্ষম? "আপনাদের জাতি কি এ ক্ষতি কিংবা ধ্বংস থেকে বিরত হবে"? (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭)

উপরোক্ত পরামর্শ দ্বারা ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) মুসলমানদেরকে বৃটিশ আদালতে শরণাপন্ন হতে বারণ করেছেন। অপর পক্ষে, তিনি বৃটিশদের সাথে অ-সহযোগের একটি স্থায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। ইমাম ছাহেব আবেগ তাড়িত অ-সহযোগে বিশ্বাস করতেন না যা একেবারেই ঝুঁকিপূর্ণ ও আত্ম বিনাশী হতো।

বিচারের জন্য বৃটিশ আদালতে শরণাপন্ন হওয়াকে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন ছাহেব শুধু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই বিবেচনা করতেন না, ইসলামী মৌলনীতির পরিপন্থীও বিবেচনা করতেন। তিনি অভিমত পোষণ করতেন যে, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন মজীদ ও হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) -কে বিচার বিভাগীয় আজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং তাই মুসলমানগণ কেন দ্বীন ইসলামকে খাটো করতে নিজেদের বিবাদ গুলোকে বৃটিশ বিচারালয়ে নিয়ে যাবেন। অতএব, যখন "সানী আযান" (জুমআর নামাযের পূর্বে দানকৃত) বিষয়ে

তাঁর প্রতিপক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নিতে মনস্থ করলেন এবং যখন তিনি এ ব্যাপারে জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁর খলিফা মাওলানা আব্দুস সালাম জব্বালপুরীকে দুঃখজনক সাথে বিষয়টি অবহিত করেন এবং লিখেন ঃ

"হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিপক্ষ বৃটিশ সরকারের বিচারালয়ে মামলা দায়ের করে ওয়াহ্হাবীদের পথে পা বাড়াতে চাইছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে বল চক্রান্ত থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ তা'লাই আমাদের সেরা হেফাযতকারী।" (মোঃ বোরহানুল হক জব্বালপুরী প্রণীত একরামে ইমাম আহ্মদ রেযা, লাহোর ১৪০১ হিজরী ১৯৮১ ইং, পৃষ্ঠা-১৩০)

অতঃপর যখন প্রতিপক্ষ বিচারালয়ে মামলা দায়ের করলেন এবং ইমাম আহ্মদ রেযাকে কোর্টে হাজিরা দেয়ার জন্য সমন জারী করা হলো, তখন যা ঘটলো তা জনাব সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলভী ☆ তিনি একজন চাক্ষুস সাক্ষী ছিলেন, তাঁর ভাষায় শোনা যাক ঃ "আলা হযরত ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) শপথ করেছিলেন যে; তিনি কখনোই কোনো বৃটিশ বিচারালয়ে হাজিরা দেবেন না। আমার জানা মতে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উপাখ্যান হলো জুমা'আর দ্বিতীয় আযান, অর্থাৎ মসজিদের মিম্বরের কাছে নাকি মসজিদের আঙ্গিনায় আযান দিতে হবে তা নিয়ে বদাউনের উলামাবর্গের সাথে মতপার্থক্য। এই মত পার্থক্য থেকে মোকদ্দমার সূত্রপাত হয়। বদাউনের দেওয়ানী আদালতে এ ব্যাপারে সেখানকার মানুষেরা একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন। ফলশ্রুতিতে ইমাম আহ্মদ রেযা খান (রহঃ) -এর প্রতি কোর্টে হাজিরা দেয়ার জন্য সমন জারী করা হয়। কিন্তু তিনি তাতে কখনোই হাজিরা দেন নি। মওলানার সম্ভাব্য আটকাদেশের মোকাবেলায় তাঁর সহস্র সহস্র ভক্ত ও অনুসারীগণ তাঁর বাসার সামনে এবং সংলগ্ন রাস্তায় জড়ো হন। তাঁরা এ মর্মে বদ্ধ পরিকর ছিলেন যে, তাঁরা ইন্তেকাল করার পরই পুলিশ ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনকে আটক করতে পারবে।" (দৈনিক জং,

☆ সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলভী ছিলেন অল পাকিস্তান এডুকেশানাল কনফারেন্সের মহাসচিব এবং "আল এলম" নামক ত্রৈমাসিক প্রত্রিকার সম্পাদক। তিনি সাম্প্রতিককালে ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর সময় তিনি কম বয়সী ছিলেন। ইমাম ছাহেবের জানাযায় তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে বেরেলভী ছিলেন না, তবে তাঁর চাচা সৈয়দ আইয়ুব আলী রেযভী ছিলেন ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের মুরিদ এবং ৩৬ বছর যাবৎ তিনি ইমাম ছাহেবের মাদ্রাসার অধ্যাপকও ছিলেন। সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলভী তাঁর এবং তাঁর চাচার প্রত্যক্ষকৃত কিছু বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে তাঁর সাক্ষ্য অকাট্য এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবীদার।

করাচী,তাং-২৫/১/১৯৭৯ ইং, পৃষ্ঠা-৬, ৫ম ও ৬ ষ্ঠ কলাম)

যদি ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) বৃটিশ প্রেমিক হতেন, তাহলে তিনি বৃটিশ বিচারালয়কে ঘৃণা করতেন না এবং নিজের মান-ইয্যতকে এভাবে হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করাতেন না, বরং তিনি স্বেচ্ছায় বৃটিশ আদালতে হাজির হতেন। এ সকল সুদৃঢ় তথ্যের উপর ভিত্তি করেই সম্ভবতঃ সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলভী নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ

"রাজনৈতিকভাবে বলতে গেলে বলতে হবে যে, ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিখুঁত মুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বৃটিশ ও তাদের শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি অথবা তাঁর পুত্রগণ, যথা- মাওলানা হামিদ রেযা খাঁন ও মোস্তফা রেযা খাঁন কখনোই শামসুল উলামা (নামী-দামী আলেম)-গণের মত সরকারী পদবী ও খেতাবের জন্য লালায়িত ছিলেন না। দেশীয় শাসকবর্গ কিংবা সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে তাঁদের কোনো যোগাযোগই ছিল না।" (প্রাগুক্ত দৈনিক জং, তাং ২৫/১/৭৯ ইং, পৃষ্ঠা-৬, কলাম ৪ এবং ৫)

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের মত তাঁর দুই জন পুত্রও বৃটিশ বিচারালয়কে ঘৃণা করতেন। মুফতী মোহাম্মদ মোস্তফা রেযা খাঁনকে একবার এক বিচারালয়ে একজন সাক্ষী হিসেবে সমন করা হয় যা বেরেলী থেকে ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এ ব্যাপারে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন তাঁর খলিফা মওলানা আবদুস সালাম জব্বলপুরীকে লিখেছেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'লার রহমতে আমার নামটি সাক্ষীদের নামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, কিন্তু মোস্তফা রেযা খাঁনকে সাক্ষী করা হয়েছে; সে (বৃটিশ) বিচারালয়কে ঘৃণা করে। সে একটি দীর্ঘ চিঠিতে আমাকে লিখেছে যে, আইনতঃ ২০০ মাইল দূরত্বের কোনো বিচারালয়ে কাউকে সাক্ষী হিসেবে তলব করা নিষিদ্ধ।" (মোঃ বোরহানুল হক জব্বালপুরী প্রণীত একরামে ইমাম আহ্মদ রেযা, লাহোর ১৪০১ হিজরী ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠা-১৪)

অনুরূপভাবে, মাওলানা হামিদ রেযা খাঁন ১৯২৫ ইং সালে মোরাদাবাদে প্রদত্ত ভাষণে মোকদ্দমা দায়ের করাকে কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং বিবৃত করেছেন যে এভাবে মুসলমানদের ধন সম্পদ তাঁদের শত্রুদের কাছে হস্তান্তরিত হচ্ছে যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে।

"বিচারালয়ে সুদ ও সম্পত্তি ক্রোকের ডিক্রী নিত্য দিন জারী করা হচ্ছে এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদ শত্রুদের কুক্ষিগত হচ্ছে যা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হচ্ছে।" (হামেদ রেযা খাঁন কৃত খুতবায়ে সাদারাত, মোরাদাবাদ, ১৯২৫ ইং, পৃষ্ঠা-৪১)

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন বৃটিশ শাসনেরও বিরোধী ছিলেন। তিনি খেলাফত ও অ-সহযোগ আন্দোলনের সময় বৃটিশদেরকে সামরিক সাহায্য প্রদানের বিরোধিতা করেন, অথচ এর কিছু বছর আগেই অ-সহযোগ আন্দোলনের কতিপয় নেতা বৃটিশদেরকে তুষ্ট করার জন্য তুর্কীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। অ-সহযোগ আন্দোলনের একজন প্রখ্যাত নেতা মওলানা মঈনউদ্দীন আজমেরী, যদিও তিনি ইমাম আহমেদ রেযা খাঁনের প্রতিপক্ষ ছিলেন, তথাপিও তিনি স্বীকার করেছেন ঃ

"অ-সহযোগ আন্দোলনের ৫নং প্রস্তাবকে উভয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিই (ইমাম আহ্‌মদ রেযা খান ও আশরাফ আলী থানবী) স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এই প্রস্তাবে বিবৃত হয়েছে যে, বৃটিশ সরকারকে সামরিক সাহায্য দেয়া যাবে না।" (মঈনউদ্দীন আজমেরী কৃত কালে-মাতুল হক্ক, দিল্লীতে প্রকাশিত ১৯২১ সালে। রইস্ আহ্‌মদ জাফরী কৃত আওরাকে গুম গুশতা গ্রন্থ, লাহোর ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ৫৭৬ হতে সংগৃহীত)

বৃটিশ সরকার ছাড়াও ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন বৃটিশ রাজা-বাদশাহ্‌দের পছন্দ করতেন না। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য অনুযায়ী জ্ঞাত হয়েছে যে, তিনি চিঠির খামের উল্টো দিকে ডাক টিকেট লাগাতেন। সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলবী লিখছেন ঃ

"সৈয়দ আল্-হাজ্জ আইয়ুব আলী রেযভীর ভাষ্যানুযায়ী ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন এমনভাবে চিঠির খামে ডাক টিকেট সংযুক্ত করতেন যার দরুন রাণী ভিক্টোরিয়া, এডওয়ার্ড-৮ এবং জর্জ-৫ এর মাথা নিচের দিকে থাকতো" (সৈনিক জং, করাচী, তাং-২৫/১/১৯৭৯ ইং, পৃষ্ঠা-৬, কলাম-৫)। তিনি শুধু এটা চিঠির খামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং পোস্টকার্ডেও রাণী ও রাজার মাথা নিচের দিকে রেখে উল্টো দিক থেকে ঠিকানা লিখতেন (দলিল চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এ লেখাটি প্রস্তুত করার সময় আমি ইসলামাবাদস্থ আল্লামা ইকবাল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবরার হুসাইনের কাছ থেকে একটি চিঠি পাই যা'তে তিনি লিখেছেন ঃ

"গতকাল এক ছাত্র আ'লা হযরত আহ্‌মদ রেযা খাঁনের একটি পোস্ট কার্ডের ফটোকপি প্রেরণ করেছে। চিঠির মধ্যে ইমাম ছাহেবের ঠিকানা লেখার পদ্ধতি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এবং তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রতিফলন করে। ঠিকানা লেখার সময় তিনি রাণীর মাথা নিচের দিকে রাখতেন, অর্থাৎ উল্টো দিক থেকে ঠিকানা লিখতেন।" (অধ্যাপক আবরার হুসাইনের পত্র, বিজ্ঞান বিভাগ, আল্লামা ইকবাল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, তাং-২৫/১১/৮০ ইং)

এ চিঠি প্রাপ্তির কিছু দিন পরে হাকিম মোহাম্মদ মূসা অমৃতসরী (সভাপতি, মারকাযে মজলিছে রেযা, লাহোর) -এর পত্রটিও হস্তগত হয় যার মধ্যে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের ঐ চিঠির একটি ফটোকপি ছিল। এটা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটা পোস্টকার্ড যাতে রাণী ভিক্টোরিয়ার একটা ছবি রয়েছে। ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন এ চিঠিটি ভারতের আহ্‌মেদাবাদস্থ মাদ্রাসায়ে তৈয়্যেবার জনৈক শিক্ষক মওলানা নাযির আহ্‌মদ রামপুরীর কাছে প্রেরণ করেন। প্রেরণের তারিখ ছিল ইয়াত্তমুল আরাফা (আরাফাত দিবস) ১৩১৩ হিজরী মোতাবেক ২৪শে মে ১৮৯৬ ইং। পত্রটি আহ্‌মেদাবাদ পৌঁছেছিল ২৭ মে ১৮৯৬ ইং তারিখ।

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) অতিরিক্ত মূল্যের ডাক টিকিট লাগিয়ে বৃটিশ সরকারকে মুনাফা লাভকারী বানাতে পছন্দ করতেন না। এটা এ ঘটনায় প্রমাণিত হয়।

ইমাম ছাহেবের এ পত্রটি সাহেবজাদা যিয়াউল মুস্তফা বিন মওলানা আবদুল কাদের শহীদ (জামেয়া কাদেরীয়া, ফয়সালাবাদ) কর্তৃক সরবরাহকৃত এবং ফিল্মটি ভাই গোলাম ইয়াছিন মিনহাজ কর্তৃক সরবরাহকৃত। আমরা উভয় বন্ধুর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

মীরাটের ধর্ম পরায়ণ ও ধনী ব্যক্তি হাজী আলাউদ্দীন একবার মওলানা মোহাম্মদ হোসাইন মীরাটী (তিলিছমী ছাপাখানার মালিক)-কে সাথে নিয়ে কতিপয় সমস্যার ব্যাপারে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের দর্শনার্থী হয়েছিলেন। ইমাম ছাহেব হাজী আলাউদ্দীনকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি অতিরিক্ত মূল্যের ডাক টিকেট ব্যবহার করে বৃটিশ সরকারকে মুনাফা লুটতে সহায়তা করছেন। হাজী ছাহেব এর অনুশীলন পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। (জাফরউদ্দীন কৃত হায়াতে আলা হযরত, ১৯৩৮ ইং, ১ম খন্ড, করাচী, পৃষ্ঠা-১৪০)

রাজা বাদশাহ্‌দের ছবি সম্বলিত টিকেট ও মুদ্রা রাখা শরীয়তে অনুমতি প্রাপ্ত। কিন্তু ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন তাঁর বেছাল প্রাপ্তির ২ ঘন্টা ১৭ মিনিট আগে (২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী/১৯২১ ইং) অসিয়ত করেছিলেন যে তাঁর বেছাল প্রাপ্তির স্থান বারান্দা হতে সকল ছবি সম্বলিত কার্ড, মুদ্রা ও খাম অপসারণ করতে হবে (হাসনাইন রেযা খাঁন প্রণীত ওয়াসায়া শরীফ, লাহোর, পৃষ্ঠা-৮)। ছবি সম্বলিত চিঠির খাম, কার্ড ও মুদ্রা ইমাম ছাহেব সহ্যই করতে পারতেন না। তাঁর অসিয়ত নামার লেখক মওলানা হাসনাইন রেযা লিখেছেন ঃ

"যখন দু'টো বাজার চার মিনিট বাকী তখন তিনি সময় কত হয়েছে তা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি দেওয়াল ঘড়ি তাঁর সামনে খোলা রাখতে বল্লেন। অতঃপর হঠাৎ তিনি বল্লেন ঃ 'ছবি সরিয়ে ফেলো'। তিনি কার্ড, খাম, টাকা পয়সাগুলো নিজের কাছে রাখতে চাননি।" (প্রাগুক্ত ওয়াসায়া শরীফ, পৃষ্ঠা-৮)

আল্লাহ্‌র কী মহিমা! আল্লাহ্‌তা'লা ইমাম ছাহেবের অছিয়ত দ্বারা তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁরই ইচ্ছা মান্য করতে বাধ্য করেছেন। ইন্তেকালের সময় একজন ব্যক্তি তাঁর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু খোদা তা'লার পছন্দকৃত বান্দাগণ এমনই সুখ ও শান্তির মধ্যে ইন্তেকাল করেন যে তাঁদের প্রস্থান অগোচরেই হয়ে যায়।

পংক্তি ঃ "এমন কী ফেরেশতারাও এ গভীর সন্তুষ্টিকে ঈর্ষা করেন,
আমার হৃতবুদ্ধি হওয়ার বিষয়গুলো তাঁরই রহস্য।"

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের পুত্র মওলানা হামেদ রেযা খাঁনও বৃটিশ সরকারকে ঘৃণা করতেন। তিনি মুসলমানদেরকে সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করে ব্যবসা বাণিজ্য করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তাদের জীবন ধারণের মান ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয়। তিনি বলেছিলেন ঃ

"মুসলমান ভাইসব! সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করুন এবং ব্যবসা বাণিজ্য করুন। আপনাদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।" (হামেদ রেযা খাঁন কৃত খুতবায়ে সালারাত, পৃষ্ঠা-৩৯)

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন যে অ-সহযোগ আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন তা আবেগ তাড়িত নয়, বরং যুক্তি ও বাস্তবভিত্তিক। গরীবীকে দূর করার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। এ অ-সহযোগ ছিল জ্ঞান ও হেকমত ভিত্তিক যা ইসলামী রীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষাকে মুসলমানদের জন্য অপকারী বিবেচনা করতেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও ছিলেন বৈরী ভাবাপন্ন। ১৯২১ ইং সালে অ-সহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি হিন্দুদের সাথে মৈত্রী স্থাপনকে নিষেধ করে একখানা পুস্তক রচনা করেছিলেন। এতে তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেন ঃ

"ইংরেজী শিক্ষা মুসলমান ছাত্রদেরকে এমন কতগুলো অর্থহীন কর্মকান্ডে ব্যস্ত রাখতে প্রণোদিত যার দরুন তারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অ-মুসলিম বনে যায়। এতে করে তারা নিজেদের ইসলামী পরিচয় ও ধর্ম সম্পর্কে বিস্মৃত হয়।" (ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন কৃত আল মোহাজ্জাতুল মোতমিনা ফি আয়াতিল মোমতাহিনা; রেসায়লে রেযাভীয়া ২য় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত, ১৯৭৬ ইং সালে লাহোর হতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৯৩)

এটাই সেই গ্রন্থ যার প্রতি বৃটিশ মদদে বিতরিত হওয়ার অপবাদ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। যদি অপবাদটি সত্য হতো, তাহলে ইংরেজী ভাষা বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে সমালোচনা করা হতো না এবং এ সকল ভিক্ত মন্তব্যও পেশ করা হতো না। গত শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে যে ব্যক্তি তুলনামূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করেছেন, শুধু তিনি এ সকল মন্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। এমন কী আজকেও আমরা এ মন্তব্যগুলো দ্বারা সঠিক পথের দিক নির্দেশনা পাবো। আমাদের সিলেবাস না আমাদেরকে খাঁটি মুসলমান বানাচ্ছে, না দেশ দরদী পাকিস্থানী বানাচ্ছে। যে সকল ছাত্র খাঁটি মুসলমান হতে পেরেছেন, তাঁরা তাঁদের পারিবারিক পরিবেশের কারণেই তা হতে পেরেছেন। (বিশেষ করে পীর-মাশায়েখগণ খানকাহ্‌ ভিত্তিক তা'লিম দ্বারা মুসলমানদের ঈমান-আকিদা বিশুদ্ধ রেখেছেন-অনুবাদক কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন)

সিলেবাস এ ব্যাপারে একেবারেই নিষ্ক্রিয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এক্ষণে সামগ্রিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন অত্যাবশ্যক, যাতে করে আমাদের ছাত্ররা উপলব্ধি করতে পারেঃ

১। আমরা কারা?
২। আমাদের দ্বীন বা ধর্ম কী?

এ দুটো প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের জাতীয় প্রগতির চাবিকাঠি।

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের জীবদ্দশাতেই "আল রেযা" শীর্ষক একটি মাসিক পত্রিকার

রাজা বাদশাহ্দের ছবি সম্বলিত টিকেট ও মুদ্রা রাখা শরীয়তে অনুমতি প্রাপ্ত। কিন্তু ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন তাঁর বেছাল প্রাপ্তির ২ ঘন্টা ১৭ মিনিট আগে (২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী/১৯২১ ইং) অসিয়ত করেছিলেন যে তাঁর বেছাল প্রাপ্তির স্থান বারান্দা হতে সকল ছবি সম্বলিত কার্ড, মুদ্রা ও খাম অপসারণ করতে হবে (হাসনাইন রেযা খাঁন প্রণীত ওয়াসায়া শরীফ, লাহোর, পৃষ্ঠা-৮)। ছবি সম্বলিত চিঠির খাম, কার্ড ও মুদ্রা ইমাম ছাহেব সহ্যই করতে পারতেন না। তাঁর অসিয়ত নামার লেখক মওলানা হাসনাইন রেযা লিখেছেন ঃ

"যখন দু'টো বাজার চার মিনিট বাকী তখন তিনি সময় কত হয়েছে তা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি দেওয়াল ঘড়ি তাঁর সামনে খোলা রাখতে বল্লেন। অতঃপর হঠাৎ তিনি বল্লেন ঃ 'ছবি সরিয়ে ফেলো'। তিনি কার্ড, খাম, টাকা পয়সাগুলো নিজের কাছে রাখতে চাননি।" (প্রাগুক্ত ওয়াসায়া শরীফ, পৃষ্ঠা-৮)

আল্লাহ্র কী মহিমা! আল্লাহ্তা'লা ইমাম ছাহেবের অছিয়ত দ্বারা তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁরই ইচ্ছা মান্য করতে বাধ্য করেছেন। ইন্তেকালের সময় একজন ব্যক্তি তাঁর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু খোদা তা'লার পছন্দকৃত বান্দাগণ এমনই সুখ ও শান্তির মধ্যে ইন্তেকাল করেন যে তাঁদের প্রস্থান অগোচরেই হয়ে যায়।

পংক্তি ঃ "এমন কী ফেরেশতারাও এ গভীর সন্তুষ্টিকে ঈর্ষা করেন,
আমার হতবুদ্ধি হওয়ার বিষয়গুলো তাঁরই রহস্য।"

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের পুত্র মওলানা হামেদ রেযা খাঁনও বৃটিশ সরকারকে ঘৃণা করতেন। তিনি মুসলমানদেরকে সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করে ব্যবসা বাণিজ্য করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তাদের জীবন ধারণের মান ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয়। তিনি বলেছিলেন ঃ

"মুসলমান ভাইসব! সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করুন এবং ব্যবসা বাণিজ্য করুন। আপনাদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।" (হামেদ রেযা খাঁন কৃত খুতবায়ে সাদারাত, পৃষ্ঠা-৩৯)

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন যে অ-সহযোগ আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন তা আবেগ তাড়িত নয়, বরং যুক্তি ও বাস্তবভিত্তিক। গরীবীকে দূর করার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। এ অ-সহযোগ ছিল জ্ঞান ও হেকমত ভিত্তিক যা ইসলামী রীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষাকে মুসলমানদের জন্য অপকারী বিবেচনা করতেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও ছিলেন বৈরী ভাবাপন্ন। ১৯২১ ইং সালে অ-সহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি হিন্দুদের সাথে মৈত্রী স্থাপনকে নিষেধ করে একখানা পুস্তক রচনা করেছিলেন। এতে তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেন ঃ

"ইংরেজী শিক্ষা মুসলমান ছাত্রদেরকে এমন কতগুলো অর্থহীন কর্মকান্ডে ব্যস্ত রাখতে প্রণোদিত যার দরুন তারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অ-মুসলিম বনে যায়। এতে করে তারা নিজেদের ইসলামী পরিচয় ও ধর্ম সম্পর্কে বিস্মৃত হয়।" (ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন কৃত আল মোহ্জ্জাতুল মোতামিনা ফি আয়াতিল মোমতাহিনা; রেসায়লে রেযাভীয়া ২য় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত, ১৯৭৬ ইং সালে লাহোর হতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৯৩)

এটাই সেই গ্রন্থ যার প্রতি বৃটিশ মদদে বিতরিত হওয়ার অপবাদ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। যদি অপবাদটি সত্য হতো, তাহলে ইংরেজী ভাষা বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে সমালোচনা করা হতো না এবং এ সকল তিক্ত মন্তব্যও পেশ করা হতো না। গত শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে যে ব্যক্তি তুলনামূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করেছেন, শুধু তিনি এ সকল মন্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। এমন কী আজকেও আমরা এ মন্তব্যগুলো দ্বারা সঠিক পথের দিক নির্দেশনা পাবো। আমাদের সিলেবাস না আমাদেরকে খাঁটি মুসলমান বানাচ্ছে, না দেশ দরদী পাকিস্থানী বানাচ্ছে। যে সকল ছাত্র খাঁটি মুসলমান হতে পেরেছেন, তাঁরা তাঁদের পারিবারিক পরিবেশের কারণেই তা হতে পেরেছেন। (বিশেষ করে পীর-মাশায়েখগণ খানকাহ্ ভিত্তিক তা'লিম দ্বারা মুসলমানদের ঈমান-আকিদা বিশুদ্ধ রেখেছেন-অনুবাদক কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন)

সিলেবাস এ ব্যাপারে একেবারেই নিষ্ক্রিয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এক্ষণে সামগ্রিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন অত্যাবশ্যক, যাতে করে আমাদের ছাত্ররা উপলব্ধি করতে পারেঃ

১। আমরা কারা?
২। আমাদের দ্বীন বা ধর্ম কী?

এ দুটো প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের জাতীয় প্রগতির চাবিকাঠি।

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের জীবদ্দশাতেই "আল রেযা" শীর্ষক একটি মাসিক পত্রিকার

প্রকাশনা আরম্ভ হয়। এ সাময়িকীটির সম্পাদক ছিলেন ইমাম ছাহেবের ভাতিজা মওলানা হাসনাইন রেযা খাঁন। এর একটি সংখ্যায় ইংরেজী শিক্ষা ও বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিম্নোক্ত ভাষায় কঠোর সমালোচনা করা হয়ঃ

"একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ হতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালু করা হয়েছে। আমরা এর থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারছি না। মুসলমানদেরকে খাঁটি মুসলমানে পরিণত করার ক্ষেত্রে এ সকল প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে সাহায্য করছে না, কিংবা ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধ বৃদ্ধি অথবা মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় নেককারিত্ব বৃদ্ধিও এগুলো সাধন করছে না। এ সকল প্রতিষ্ঠানের যোগ্য ছাত্ররা ইসলামী মৌলনীতি, সৌহার্দ্য ও ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য, ইসলামী লেন-দেন পদ্ধতি এবং ইসলামী জীবন ধারণ পদ্ধতির প্রতীক হতে ব্যর্থ। সংক্ষেপে, এ সকল প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের জন্য উপকারী নয়।" (আল্ রেযা যিল্কদ সংখ্যা, ১৩৩৮ হিজরী/১৯৪০ ইং, পৃষ্ঠা-৫, বেরেলী হতে প্রকাশিত)

ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে কী বিজ্ঞ বিশ্লেষণ! বর্তমানে বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতি যখন আমাদের সামনে উপস্থিত, তখন এই বিশ্লেষণের প্রতিটি বিষয়ই আমাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করছে। ইংরেজদের শুভাকাংক্ষী কোনো পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে এই সমালোচনা আশা করা একেবারেই অসম্ভব।

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) শুধু ইংরেজী শিক্ষাকেই ঘৃণা করতেন না, বরং তিনি বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও ঘৃণা করতেন। তিনি এক বিচার বিভাগীয় প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন ঃ

"ইংরেজ জামা-কাপড় পরিধান করার অনুমতি নেই, একদম হারাম। ইংরেজ পোষাকে নামায আদায় করা হলো মাকরূহে তাহ্রিমী, প্রায় হারামের সম পর্যায়ের। মুসলমান পরিচ্ছদে এই সকল নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে, নতুবা ব্যক্তিটির গুনাহ্ হবে।" (ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন প্রণীত আল্ আতায়া, ফয়সলাবাদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪২)

এই কারণে যখন নদ্ওয়াতুল উলামার সভায় ব্যক্তিবর্গ ইংরেজ সার্ট পরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তখন ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) ব্যঙ্গ স্বরূপ নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো পাঠ করেন ঃ

"যদি নেক্কার ব্যক্তিদের পোষাক তোমাদের প্রয়োজন হয়, তবে হাল-ফ্যাশনের কোট ও প্যান্ট মওজুদ রয়।" (ইমাম আহ্মদ রেযা রচিত আমল আল্ আবরার, ১৯০০ খ্রীঃ পাটনা হতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-২০)

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের পুত্র মওলানা হামেদ রেযা খাঁন মোরাদাবাদে তাঁর সভাপতির ভাষণে বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির কঠোর সমালোচনা করেন। ১৯২৫ ইং সালে মোরাদাবাদে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে প্রকাশ্য সমালোচনা করেন, তা আমাদের মনযোগ আকর্ষণের দাবীদার এবং তা অধ্যয়ন করা আবশ্যক। নিখিল ভারত সুন্নী সভা যা ২০ হতে ২৩শে শা'বান ১৩৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৬ হতে ১৯শে মার্চ ১৯২৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে মওলানা হামেদ রেযা খাঁন বলেছেন ঃ

"আমাদের কতিপয় সাথী যাঁরা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে একেবারেই অজ্ঞ কিন্তু মুসলমানদের নেতৃত্বভার গ্রহণে আগ্রহী, তাঁরা বৃটিশদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তাঁরা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশারদ তো ননই, এমন কী নেক্কার ও জ্ঞানী আলেমদের সাহচর্যও তাঁরা লাভ করতে সক্ষম হন নি। ইংরেজ খ্রীষ্টানদের সান্নিধ্যেই তাঁদের জিন্দেগী গুজরে গেছে। ইংরেজ সংস্কৃতির শরাবে তাঁরা গভীরভাবে মাতাল ছিলেন। তাঁরা মুসলমান তরুণদেরকে বৃটিশ সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে সফলও হয়েছিলেন। খ্রীষ্টান সংস্কৃতি কখনোই মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। ফলে সংস্কৃতিগত অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়েছে। তাঁরা তা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির ধরণ সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়াতে তাঁরা তাঁদের পশ্চিমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে স্থায়ী রূপ দানে ব্রত হয়ে দ্বীন ইসলামেরই বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা মুসলমানদেরকে ইসলামী সংস্কৃতি পরিহার করে খ্রীষ্টানী সংস্কৃতি গ্রহণে বাধ্য করেছেন। পশ্চিমা সংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবল দ্বারা মুসলমানগণ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।" (মওলানা হামেদ রেযা খাঁন ছাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ, মোরাদাবাদে প্রকাশিত, ১৯২৫ ইং)

পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষতিকর প্রভাব অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক। এটা একটা বাস্তব ঘটনা যে, ইংরেজ সংস্কৃতির প্রবক্তাগণ তাঁদের নিজেদের ইসলামী সংস্কৃতিকেই ঘৃণা করতেন এবং ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধ সম্পর্কে নিজেদের সাথীদের মাঝে বিদ্বেষভাব প্রসার করতেন। ফলশ্রুতিতে দাড়ি কামানো হয়, ইসলামী লেবাস্ ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়, মাথা থেকে টুপি নামিয়ে ফেলা হয়, মুসলমান নারীরা পর্দা ছিঁড়ে ফেলে, এমন কী দোপাট্টাও ফেলে দেয়। কার্পেট দূর হয়ে গিয়ে ওর স্থলাভিষিক্ত হয় অত্যাধুনিক ডিজাইনের সোফা সেট। কোনো জাতিই এত ব্যাপকভাবে নিজ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে নি। ড্রয়িং কামরা থেকে বইপত্র সরিয়ে তদস্থলে মাটির পুতুল ও মডেল স্থাপন করা হয়। আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) মক্কার

বোতখানা থেকে যে মূর্তিগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তাই আজ আবার প্রতিটি আধুনিক মুসলমানের ঘরকে অলংকৃত করছে। আরবী ও পারসিক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে মুসলমানদের মনন নিজেদের ইসলামী ঐতিহ্য ও অতীত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আফসোস, নতুন জগতের সন্ধানে বেরিয়ে তাঁরা নিজেদের জগতকেই হারিয়ে ফেলেছেন। ইসলামী মূল্যবোধের ও করণীয় কর্মকান্ডের পুনরুজ্জীবনে এবং পশ্চিমা রীতি-নীতি বর্জনে নতুন চিন্তা-ভাবনার আজ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

চিন্তা-চেতনা ও সমালোচনা

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর চিন্তাধারা ছিল সর্বান্তকরণে ইসলামী। তিনি পশ্চিমা ধ্যান ধারণার তোয়াক্কা করতেন না। এ কারণেই তিনি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে কঠোর সমালোচনা করতেন এবং ওজন সম্পন্ন যুক্তি দ্বারা তার খন্ডন করতেন। ডেমোক্রেটিস, আইজাক নিউটন, আলবার্ট আইনস্টাইন, আলবার্ট এফ, পোর্টা প্রমুখের কঠোর সমালোচনা করে ইমাম ছাহেব তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে যথাযথ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা খন্ডন করেছিলেন এবং তা গৃহীতও হয়েছিল। ☆

আইজাক নিউটনকে সমালোচনা করে ইমাম ছাহেব মন্তব্য করেন ঃ

."নিউটন লিখেছেন যে, পৃথিবী এতই সংকুচিত হয়েছে যার দরুন এর লোমকূপগুলো

☆ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক আলবার্ট পোর্টা, স্যান ফ্রান্সিসকো আমেরিকার জ্যোতি বিজ্ঞানী, ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কয়েকটি গ্রহ সূর্যের সামনে চলে আসার দরুন উদ্ভূত মধ্যাকর্ষণ পৃথিবীতে তান্ডব সৃষ্টি করবে। এ খবরটি বান্‌কিপুর ভারত হতে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক এক্সপ্রেস পত্রিকায় ১৮ই অক্টোবর ১৯১৯ সালে ছাপা হয়। ফলে ভারতে ত্রাস দেখা দেয়। এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলা হযরতকে জানানোর পরে তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা তা খন্ডন করেন। ১৯১৯ সালেই তিনি এর খন্ডনে একটি পুস্তক লেখেন যার নাম মুঈন-ই-মুবীন বাহারাদ দার শামস্-সাকুন-ই-যমীন। ১৯১৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সংখ্যার নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ১২/১২/ ১৯১৯ তারিখে কয়েকটি দেশে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সারা বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন সেই দিন। কিন্তু কিছুই ঘটলো না এবং দিনটি নিরাপদে কেটে গেলো। এই প্রাকৃতিক ঘটনা আলা হযরতের কথাকেই সমর্থন দিয়েছিল যা'তে তিনি বলেছিলেন-"একজন মোমেনের বিজ্ঞতাকে ভয় কর, কেননা তিনি আল্লাহর জ্যোতি দ্বারা দর্শন করেন।"-মাসউদ আহ্‌মদ

অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তাহলে এর ঘনত্ব (নিউটনের ভাষ্যানুযায়ী) এক ঘন-ইঞ্চির বেশী হতে পারে না।" (মাসিক আল রেযা পত্রিকায় প্রকাশিত ফওযে মুবীন দার রদ্দে হরকত-ই-যমীন শীর্ষক প্রবন্ধ, বেরেলী, যেল্‌কদ ১৩৩৮ হিজরী/১৯১৯ ইং সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৩৯)

অতঃপর ইমাম ছাহেব লিখেছেন যে, নিউটন একটি অবৈজ্ঞানিক ও উদ্ভট ধারণা ব্যক্ত করেছেন (প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা-৩৯)। অনুরূপভাবে, তিনি আইনস্টাইন ও মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলবার্ট এফ, পোর্টাকেও সমালোচনা করেন। উভয়ই তাঁর সমসাময়িককালের ছিলেন। যখন পোর্টার ভবিষ্যদ্বাণী পাটনার দৈনিক এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন মওলানা জাফর উদ্দীন বিহারী পেপার কাটিং ইমাম ছাহেবের কাছে প্রেরণ করেন এবং তাঁর মতামত জানতে চান। ইমাম ছাহেব এ ভবিষ্যদ্বানীকে ছেলেমানুষী আখ্যায়িত করেন। তিনি আরো বলেন যে, পোর্টা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক,খ,গ-ও জানেন না। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীটি ভুলে ভরপুর (মওলানা জাফরউদ্দীনকে লেখা ইমাম ছাহেবের পত্র, তাং ১৪ই সফর ১৩৩৮ হিজরী/১৯১৯ইং)। পরবর্তী কালে ইমাম ছাহেব জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর একটি বই লেখেন যার মধ্যে তিনি পোর্টা-র ভবিষ্যদ্বাণীকে খন্ডন করেন।

খ্রীষ্টানদের সমর্থক, অনুসারী ও প্রেমিক গং

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন বৃটিশ ও তাঁদের শুভাকাংক্ষী, অনুসারী এবং প্রেমিকদের কঠোর সমালোচনা করেন। বৃটিশদের দালাল হলে তিনি এ রকম করতেন না।

মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী বৃটিশের একজন শুভাকাংক্ষী ছিলেন এবং বৃটিশরাও তাঁকে পছন্দ করতেন। ডঃ মোহাম্মদ ইকবালের মতানুসারে কাদিয়ানী আন্দোলনের প্রথম দুটো বৈদেশিক কেন্দ্র ভোকিং (ইংল্যান্ড) ও আশেকাবাদ (সোভিয়েত ইউনিয়ন)-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। মীর্যা গোলাম আহ্‌মদের বিরুদ্ধে প্রথম কলম ধরেন মওলানা হামেদ রেযা খাঁন। কানপুর হতে ১৩১৫ হিজরী/১৮৯৭ ইং তারিখে প্রেরিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি নিম্নোক্ত পুস্তিকাটি প্রণয়ন করেন, আছ্ ছারেমুর রব্বানী আ'লা ইছ্‌রায়ে কাদিয়ানী। পাটনা হতে প্রকাশিত মাসিক তোহফায়ে হানাফিয়্যা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েক মাস এ পুস্তিকাটি ছাপা হয়। অতঃপর বেরেলী হতে এটা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। (ইমাম আহ্‌মদ রেযার রচিত আছ্ ছুয়ু ওয়াল ইকাব পুস্তকের সাথে মওলানা হামেদ রেযা খাঁন একটি পত্র প্রচার করেন যা'তে তিনি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং এই লক্ষ্যে তিনি

আর্থিক দান কামনা করেন। তাঁর এ আবেদন ১৪ই যেলক্বদ ১৩২০ হিজরী তারিখে করা হয়-অধ্যাপক মাসউদ আহ্‌মদ)

১৩২০ হিজরী/১৯০২ খ্রীষ্টব্দ সালে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব অমৃতসরের মওলানা মোঃ আবদুল গনীর এক প্রশ্নের জবাবে আহ্ ছুয়ু ওয়াল ইকাব নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এ পুস্তকের ১ম সংস্করণটি (১৩২০ হিজরীতে বেরেলী হতে প্রকাশিত) আমার সামনে মওজুদ। মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী ও তাঁকে নবী মান্যকারী তাঁর ভক্তদেরকে ইমাম ছাহেব কাফের এবং মুরতাদ ঘোষণা করেছেন। ইমাম আহ্‌মদ রেযার ভাই মওলানা মোহাম্মদ হাসান রেযা খাঁন ১৩২৩ হিজরী সালে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে একটি সাময়িকী পত্রিকা বের করেন। এ সাময়িকীটির ২য় সংখ্যা (লাহোর হতে সৈয়দ আইয়ুব আলী রেযভী কর্তৃক ১৯২৫ ইং সালে প্রকাশিত) আমার সামনে মওজুদ। সংক্ষেপে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন, তাঁর ভ্রাতা ও তাঁর পুত্রগণ কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে প্রচুর লিখেছেন এবং প্রচার করেছেন।

পাকিস্তানে ১৯৫৩ ইং সালে ১ম খত্‌মে নবুয়্যাত আন্দোলনের সময় ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের অনুসারীগণ পুরোধায় ছিলেন এবং কেউ কেউ শাহাদাতও বরণ করেন (মওলানা আব্দুল আলীম সিদ্দিকী কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে একটি পুস্তক লিখেন যার আরবী সংস্করণের নাম আল্ মিরাত, উর্দু সংস্করণের নাম মির্যায়ী হাকিকাত কা ঈযহার এবং ইংরেজী সংস্করণের নাম THE MIRROR)। ২য় খত্‌মে নবুয়্যাত আন্দোলন (১৯৭৪ ইং) চলাকালে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের উত্তরসূরী আল্লামা আব্দুল আলীম সিদ্দিকীর পুত্র আল্লামা শাহ্ আহ্‌মদ নূরানী ও মওলানা আমজাদ আলী আযমীর পুত্র আল্লামা আবদুল মোস্তফা আল্ আযহারী এ উদ্দেশ্যে কাংক্ষিত সাহায্য ও খেদমত করেছেন। ১৯৭৭ ইং সালের ৩০শে জুন তারিখে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান সংখ্যা লঘু ঘোষণার লক্ষ্যে বিরোধী দল পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তা অবশেষে হাউস্ কর্তৃক পাশ হয়ে যায়। ১৩১৫ হিজরী সালে মওলানা হামেদ রেযা খাঁন ও ১৩২০ হিজরী সালে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন এবং অন্যান্য উলামাগণ বিভিন্ন সময়ে যে ফতোয়া প্রদান করেন, তা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সমর্থন দিয়ে বাস্তবায়িত করে।

ইংরেজদের অনুসারী, প্রেমিক ও সাহায্য প্রত্যাশী ব্যক্তিরা ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ সভ্যতা সংস্কৃতি পরিবেশনে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের প্রচেষ্টার সাথে অ-সহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দুদেরকে তুষ্ট করার জন্য মুসলমান জাতিয়তাবাদী নেতাদের কৃত কর্মের একটি

তুলনামূলক গবেষণা ইমাম ছাহেব পরিচালনা করেন এবং অতঃপর লিখেন ঃ

"নেতৃবৃন্দ বৃটিশদের দাসত্বে এখন অনুতাপ করছেন, অথচ ইতিপূর্বে তাঁরা এর অনুমোদন করেছিলেন ☆।

এ দাসত্বের পরিণতি ঃ বৃটিশের মত বানর নাচ নাচা, শরীয়তের হেয়করণ, নাস্তিক্যবাদের প্রসার এবং প্রকৃতি পূজা ধ্বংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে।" (ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন কৃত আল্ মোহ্‌জ্জাত আল্ মো'তামিনাহ্, লাহোরে প্রকাশিত, ১৯৭৪ ইং, পৃষ্ঠা-৯৪)

বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকরণ হতে নিঃসৃত ক্ষতিকর ফল সম্পর্কে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) বাস্তব ধর্মী বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি প্রতিটি ক্ষতিকেই চিহ্নিত করেছিলেন যার দরুন ইংরেজ সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইমাম ছাহেবের মতানুযায়ী এই অনুকরণ নিম্নোক্ত বদ ফলাফলগুলোর জন্ম দিয়েছে ঃ

ইংরেজ চাল-চলন গ্রহণ ঃ অর্থাৎ, মুসলমানগণ নিজেদের সংস্কৃতি বাদ দিয়ে ইংরেজ চাল-চলন গ্রহণ করে নেন। তাঁরা নিজেদের সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে অপরেরটা গ্রহণ করেন। বর্তমানে এ বিষয়টি সর্বজন বিদিত।

শরীয়তকে হেয়করণ ঃ পশ্চিমা চিন্তা চেতনার আলোকে মুসলমানগণ শরীয়তের আদেশ নিষেধকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করতে শুরু করেন এবং তাঁরা ধর্মীয় মৌলনীতিসমূহের সাথে দ্বিমত পোষণ করার মত ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে মোটেও লজ্জিত হন নি। এ বিষয়টিকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দেয়া উচিৎ।

☆ উদাহরণ স্বরূপ-১৯১৯/২০ সালের খেলাফত আন্দোলনে মওলানা মোঃ আলী জওহার বৃটিশদের বিরোধী হলেও ১ম বিশ্বযুদ্ধে তিনি বৃটিশের পক্ষে তুর্কীদের বিরোধিতা করেছিলেন যা তাঁর ভাষায় নিম্নরূপ-"আমরা যুদ্ধের সাহায্য স্বরূপ ১৫০০ কোটি রূপী দান করেছিলাম এবং যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সৈন্য পাঠিয়েছিলাম। আমরা আমাদের ঈমান বিসর্জন দিয়েছিলাম, ফলে মুসলমানগণ পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠেছিলেন" (আওরাকে গুম্ গুশ্‌তা, ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১২০)। অনুরূপভাবে, অ-সহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী গান্ধীজি ১ম বিশ্বযুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। চাক্ষুস সাক্ষী সৈয়দ সোলেমান আশরাফ লিখছেন, "যখন তুর্কীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো হলো, তখন কেউই প্রতিবাদ করলো না। পক্ষান্তরে শ্রী গান্ধীজি বিদেশে সৈন্য প্রেরণে ও সৈন্য সংগ্রহে অনেক পরিশ্রম করেছিলেন" (সৈয়দ সোলেমান আশরাফ রচিত আল্ নূর, আলীগড় হতে প্রকাশিত, ১৩৩৯ হিজরী/১৯২১ ইং, পৃষ্ঠা-১৪৭ এবং ১৪৯)।

নাস্তিক্যবাদ ঃ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বে-খবর হয়ে মুসলমানরা নাস্তিক্যবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। উদাহরণ স্বরূপ, মওলানা আবুল কালাম আযাদ (কংগ্রেস নেতা) ও মওলানা আবদুল মজীদ দরিয়াবাদী স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা কিছু সময়ের জন্য নাস্তিক ছিলেন। বর্তমানেও কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি নাস্তিক্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আছেন।

প্রকৃতিবাদ ঃ অর্থাৎ মুসলমানরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলেন; প্রকৃতিকেই তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতেন। এভাবে তাঁরা ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁরা পুরোপুরিভাবে যুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের হৃদয়গুলো তরীকত ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি শূন্যও হয়ে পড়েছিল।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর লেখনী হতে এটা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি অ-সহযোগ আন্দোলনে হিন্দুদেরকে সহযোগিতা দানকারী অথচ ইংরেজ সভ্যতা-সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করার প্রক্রিয়াকে ঘৃণাকারী ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্য সমূহকে সন্দেহ করতেন। এক স্থানে তিনি বিচক্ষণতার সাথে লিখেছেন ঃ

"বৃটিশ চাল-চলন গ্রহণ হতে মুক্তি লাভ করা এবং নাস্তিক্যবাদ ও প্রকৃতিবাদ বর্জন করা হৃদয়কে প্রশান্তি দানকারী ধ্যান ধারণা। আল্লাহ্ তা দান করুন, কিন্তু এগুলো সাহায্য ও সংশ্লিষ্টতা এড়িয়েই অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন তা নির্বাপিত করেই তা করা সম্ভব। অন্যান্য অনেক নেতার মাঝেও এর বিক্ষিপ্ত শিখা প্রজ্জ্বলিত পাওয়া যাচ্ছে।" (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কৃত আল্ মোহাজ্জাত আল্ মোতামিনা ফি আয়াত আল্ মোমতাহিনা; রেফারেন্স-রাসায়েল-ই-রাযভিয়া ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৩, লাহোর ১৯৭৬ ইং)

একইভাবে যখন নদ্ওয়ার উলামারা বৃটিশের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেন ও তাঁদের সভায় বৃটিশদেরকে আমন্ত্রণ করতে শুরু করেন এবং তাঁদের মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর বৃটিশদের দ্বারা স্থাপন করান, তখন ইমাম আহমদ রেযা খাঁন তাঁদের তীব্র সমালোচনা করেন। ইমাম ছাহেবের মতানুযায়ী নদ্ওয়ার লোকেরা বৃটিশ শাসন সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধ্যান ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন ঃ

"খোদা তা'লা সকলের প্রতিই সন্তুষ্ট এবং সকলেরই প্রতি অনুরূপ আচরণ করেন। তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে তিনি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন না। বৃটিশ সরকারের ব্যাপারটি তাঁর পছন্দেরই একটি নিদর্শন। বৃটিশ সরকারের উদাহরণকে সামনে রেখে খোদার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সম্পর্কে একটি ধারণা যে কোনো ব্যক্তি গঠন করতে পারে।" (আবদুল ওয়াহেদ কৃত দরবার হক-ও-হেদায়েত, পাটনায় প্রকাশিত, ১৩১৮ হিজরী/১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা-১২৩)

নদ্ওয়াতুল উলামা ১৩১০ হিজরী/১৮৯২ সালে কানপুরস্থ মাদ্রাসায়ে ফয়েযে আম-এর

বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জ মোরাদাবাদের খলিফা মওলানা মোহাম্মদ আলী মনগারী এর প্রথম সভাপতি হন। মওলানা লুৎফুর রহমান (আলীগড়) এবং মওলানা আহমদ হাস্সান কানপুরী ছিলেন সংস্থাটির পৃষ্ঠপোষক। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কানপুরে অনুষ্ঠিত এর একটি বার্ষিক সভায় যোগ দান করেন এবং পাঠ্যক্রম সংশোধনের উপর একটি প্রবন্ধও পাঠ করেন। (নদ্ওয়াতুল উলামার বার্ষিক প্রতিবেদন, কানপুর, ১৩১২ হিজরী)

কিন্তু অকস্মাৎ নদ্ওয়াতুল উলামার পলিসির পরিবর্তন ঘটে। তাই ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) দূরে সরে দাঁড়ান এবং ১৩১৩ হিজরী/১৮৯৫ সালে সংস্থাটির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ঐ একই সালে নদ্ওয়াতুল উলামার লক্ষ্ণৌ সভায় রাণী ভিক্টোরিয়া ও লেফটেনান্ট গভর্ণর লর্ড এলজিনকে প্রশংসা করে একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করা হয় যার কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

"রাণী ভিকটোরিয়ার শাসন দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ হোক; যতদিন তারকা রাজি আকাশে জ্বল জ্বল করবে, জোনাকি পোকা পৃথিবীকে আলোকিত করে রাখবে, যতদিন বাগানে ফুল তার সৌরভ ছড়াবে, এবং গাছে পাখিরা গান করবে, ততদিন যেন লর্ড এলজিনের তারকা জ্বল জ্বল করে এবং তাঁর মর্যাদা যেন উত্তীন হয়।" (খাজা রাযী হায়দার কৃত তাযকিরায়ে মুহাদীসে সুরতী, করাচী ১৯৮১, পৃষ্ঠা-১০৬)

এটা নিশ্চিত যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) এমন কোনো সংস্থার সাথে জড়িত থাকতে পারতেন না যার কর্মকর্তারা রাণী ভিকটোরিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ইমাম ছাহেবের এমনই মনোভাব ছিল যে, রাণী ভিকটোরিয়ার ছবি সম্বলিত পোস্টকার্ডে ঠিকানা লেখার সময় তিনি উল্টো দিক থেকে শুরু করতেন যাতে রাণীর ছবি নিম্নমুখী থাকে। তাই তিনি নদ্ওয়াতুল উলামাকে তীব্র সমালোচনা করে তাঁর "হাদাইকে বখশিশ" নামক গ্রন্থে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখেন। এ সকল ছত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) উলামাগণের গদিতে বৃটিশদের উপবেশন, ধর্মীয় সভাগুলোকে বৃটিশ ফ্যাশন অনুযায়ী সজ্জিত করণ, বৃটিশ সাহায্য গ্রহণ কিংবা তাদেরকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বরণ ইত্যাদি কর্মকে পছন্দ করতেন না। এ কারণেই ১৯০০ ইং সালের পাটনা সেশনে তিনি তাঁর রচিত ও পঠিত আরবী কাসিদায় নদ্ওয়ার লোকদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ

"তোমরা এ জগতে এবং পরকালে তোমাদের প্রাপ্য অংশকে বিনষ্ট করেছ,
শপথ খোদার, নিশ্চয়ই এটা মহা ক্ষতি।"

ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক বন্ধন

একজন ব্যক্তির পছন্দ এবং তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিভাত করে। তিনি যে কেউ হতে পারেন, কিন্তু এটা জরুরী যে তাঁর বন্ধুত্বের পাত্র তাঁরই মন-মানুসিকতার সম পর্যায়ের হতে হবে। এক্ষণে আমরা ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর বন্ধু-বান্ধব ও তাঁর মরুব্বী এবং তাঁর কথাবার্তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবো। আমরা দেখবো তাঁর সখ্যতা বৃটিশদের সাথে ছিল কি-না, অথবা তাঁর বন্ধুবর্গ ও মরুব্বীগণ বৃটিশদের শুভাকাংক্ষী ছিলেন কি-না।

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) ১৩৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৯১৯ সালে মওলানা আবদুস্ সালামের আমন্ত্রণে জব্বালপুরে গিয়েছিলেন। উল্লেখ থাকা আবশ্যক যে, ঐ বছরই খেলাফত আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং তখন ব্যাপক বৃটিশ সরকার বিরোধী কার্যক্রম চলছিল। জব্বালপুরে তাঁর ক্ষণস্থায়ী সফরে ইমাম ছাহেব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখার উদ্দেশ্যে বের হতেন। মুফতী মোহাম্মদ বুরহানুল হক জব্বালপুরী (মওলানা আবদুস সালামের পুত্র) যিনি বর্তমানে প্রায় এক'শ বছর বয়সী হবেন, তিনি লিখেছেন, "একদিন আছর নামাযের বাদে মওলানা (ইমাম ছাহেব) প্রকৃতি দর্শনের উদ্দেশ্যে 'গান্ ক্যারেজ' ফ্যাক্টরীর দিকে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে রওয়ানা হলেন। বৃটিশ সেনা বাহিনীর কতিপয় সৈন্য তখন ফ্যাক্টরী হতে তাদের ছাউনিতে প্রত্যাবর্তন করছিল। তাদেরকে দেখে আ'লা হযরত বল্লেন, 'হতভাগার দল, এরা একদম বানর'। (মুফতী বুরহানুল হক কৃত একরামে ইমাম আহ্‌মদ রেযা, লাহোর ১৪০১ হিজরী/১৯৮১ ইং, পৃষ্ঠা-৯১)

যে ব্যক্তি ইউরোপীয়দেরকে বানর আখ্যা দেন, তিনি তো তাদের শুভাকাংক্ষী হতে পারেন না।

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সম্পর্কে বলেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মওলানা আবদুল কাদের বদায়ুনী (১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক মওলানা ফয়েজ আহ্‌মদ বদায়ুনীর ভ্রাতা) এবং মওলানা কেফায়েত আলী কাফী যিনি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। মওলানা ফয়েজ আহ্‌মদ আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও শাহাজাহানপুর রনাঙ্গণে লড়াই করেছিলেন এবং সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন। মওলানা কেফায়েত আলী কাফী ছিলেন মোরাদাবাদ অঞ্চলের 'সদরুশ্ শরীয়া'। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৮৫৮ সালে তাঁকে হত্যা করা হয়। ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন এই মুজাহিদকে অত্যধিক ভালবাসতেন যা তাঁর লি-খিত দুইটি পংক্তিতে প্রতিভাত হয়। ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব (রহঃ) মওলানা কাফীর না'ত পদ্যের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে একটি কাতায় (ছত্রে) তিনি কাফীকে না'তিয়া পদ্যের রাজা এবং নিজেকে তাঁর প্রধান মন্ত্রী হিসেবে স্বীকার

করেছিলেন। ইমাম ছাহেব লিখেছেন,

"আমার মুখের (বাণীর) সৌরভে বিশ্ব-ভূবন হয়েছে সুগন্ধময়,

এথা মিষ্টি সুরগুলোর ভিক্ত কোনো পরশ নেই,

কাফী হলেন কবিদের রাজা যিনি মহানবীর প্রশংসায় লিখছেন,

আল্লাহ্‌র করুণা দ্বারা আমিই হবো প্রধানমন্ত্রী।" (ইমাম আহ্‌মদ রেযা কৃত হাদাইকে বখ্‌শিশ, বদায়ুন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৩/৯৪)

এই পদ্যটি ১৯ শতকের শেষ ভাগে রচিত হয়েছিল যখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন ছিল যে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের নৈকট্য স্বাধীনভাবে প্রকাশ করাও কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর একজন বৃটিশ দালালের কাছ থেকেও এটা আশা করা অসম্ভব ছিল যে তিনি বৃটিশের একজন ঘোর শত্রুর সাথে তাঁর না'ত পদ্যের যোগসূত্র স্থাপন করবেন।

অপবাদ ও তার কারণসমূহ

এ যাবত পেশকৃত প্রমাণাদি ও তথ্যাবলী হতে পরিস্ফুট হয় যে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) বৃটিশের শুভাকাংক্ষীও ছিলেন না, আবার ইংরেজ তথা তাঁদের প্রশাসন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, ধ্যান-ধারণা এবং চেহারারও প্রেমিক ছিলেন না। বৃটিশের সাথে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, তাতে তাঁর ঘৃণা পরিমাপ করা যায়।

"তারা হয়তো একটা সুযোগ পেতে পারে এ কথা বলার যে, তিনি (ইমাম ছাহেব) মুস-লমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। তিনি বৃটিশের মিত্র ছিলেন।" (ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন কৃত দাওয়ামুল আইশ, ১৯২০ ইং, লাহোরে ১৯৮০ সালে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-৯৪/৯৫)

তাহলে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ)-কে বৃটিশের দালাল আখ্যা দেয়ার প্রকৃত কারণগুলো কী ছিল? এই লেখকের মতে কারণগুলো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় প্রকৃতিরই ছিল।

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর সাথে তাঁর প্রতিপক্ষের মতদ্বৈততা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল যা তাঁদেরকে বিরক্ত করে তোলে। কিন্তু এগুলোর সবই ধর্মীয় অঙ্গণে সীমাবদ্ধ ছিল। ইমাম ছাহেবের প্রতিপক্ষ তাঁর তীব্র সমালোচনার মুখে রাজনৈতিক অঙ্গণে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা এতে যথেষ্ট সফলও হয়েছিলেন। বৈরী প্রচার প্রপাগান্ডা ইমাম ছাহেবকে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্ধ শতাব্দীকাল গোপন করে রেখেছিল। অবশেষে এই মিথ্যা প্রচারণা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে এবং সত্য

উদ্ভাসিত হয়েছে।

১৯১৯ ইং সালে খেলাফত খেলাফত আন্দোলন শুরু করা হয়। বৃটিশ ও তার মিত্রদের তরফ হতে সুলতান আবদুল হামিদ খাঁনের তুর্কী সাম্রাজ্য যে হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ আন্দোলন আরম্ভ করা হয়। বাহ্যিকভাবে এটা একটা ধর্মীয় আন্দোলন ছিল, কিন্তু এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল একেবারেই রাজনৈতিক যা প্রতিভাত হয়েছে গান্ধী ও হিন্দুদের এর সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে। বস্তুতঃ এ আন্দোলনের ছত্রাবরণে হিন্দুরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সাদাসিদা মুসলমান এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) রাজনৈতিক এ কপটতা পছন্দও করতেন না, আবার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ধর্মকে বলি দিতেও রাজী ছিলেন না। খেলাফত আন্দোলনের প্রবক্তাগণ মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে একটি কূটচালের আশ্রয় নেন। তাঁরা তুর্কী সুলতানকে খলিফা এবং তুর্কী সাম্রাজ্যকে তুর্কী খেলাফত ঘোষণা করেন। ইসলামী শরীয়তে খলিফাতুল্ ইসলাম ও সুলতানের জন্য পৃথক পৃথক বিধান দেয়া হয়েছে। সুলতান ও তাঁর রাজ্যের প্রতিরক্ষা করা হলো পরিস্থিতি অনুযায়ী আধা জরুরী। এই পার্থক্যই ইমাম আহ্মদ রেযা (রঃ)-কে খেলাফত আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তিনি আবদুল হামিদকে তুরস্কের সুলতান হিসেবেই বিবেচনা করতেন। তিনি তাঁকে খলিফা হিসেবে স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু তিনি সুলতানকে পরিস্থিতি অনুযায়ী সাহায্য করাকে আধা জরুরী বিবেচনা করতেন। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রতিভাত করেছে এ বাস্তবতাকে যে, তুর্কীরা সুলতান আবদুল হামিদকে একজন রাজা এবং তার প্রশাসনকে একটি সাম্রাজ্য বিবেচনা করতেন। এ কারণেই বৃটিশরা নয়, বরং মোস্তফা কামালা পাশা (কামাল আতাতুর্ক) স্বয়ং আবদুল হামিদকে রাজার পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁকে তুরস্ক থেকে নির্বাসিত করেন। এতে সকল রাজনীতিবিদই হতভম্ব হয়ে যান। মুখ রক্ষার্থে মুসলমান নেতৃবৃন্দ মোস্তফা কামাল পাশাকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। অথচ তিনিই সুলতান আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন যা বৃটিশরা ধারণা করেছিলেন।

খেলাফত আন্দোলনে অসম্পৃক্ততার কারণে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়। আজো তা করা হচ্ছে, যদিও বাস্তবতা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদগণ এ প্রচারণার সাথে জড়িত ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, ১৩৩৯ হিজরী/ ১৯২১ সালে বেরেলীতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ্ সংস্থার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সূত্রে মওলানা আবুল কালাম আজাদ (কংগ্রেস নেতা) ঐ সালের ১৩ই রজব একখানা

পত্র লিখেন যা কূটনৈতিক চাল শূন্য ছিল না। এর থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের প্রতিপক্ষ তাঁর নির্মল ধর্মীয় অবস্থানকে রাজনৈতিক রং লাগিয়ে তাঁকে সর্ব সাধারণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন ঃ

"অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে ইসলামী খেলাফতের প্রতিরক্ষা, অ-সহযোগ ও ইসলামের শত্রুদের সহায়তা দান ইত্যাদি চলতি বিষয়াদির ক্ষেত্রে আপনার (ইমাম ছাহেবের) মত পার্থক্য সর্বজন বিদিত।" (মোহাম্মদ জালালউদ্দীন প্রণীত 'আবুল কালাম আজাদের ঐতিহাসিক পরাজয়, লাহোর, পৃষ্ঠা-৮০/৮১)

ইতিহাসে অজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তিই এ সকল কথায় বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু যাঁরা সম্যক অবহিত তাঁরা ভাল করেই জানেন যে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন তুর্কীদেরকে সাহায্য করার বিরোধী ছিলেন না (তাঁর দল রেযায়ে মোস্তফা তুরস্ককে সাহায্য করার চেষ্টায় রত ছিল; বিস্তারিত জানার জন্য ইমাম আহ্মদ রেযা প্রণীত দাওয়ামুল আয়শ ফিল আইম্মা মিন কুরাইশ, লাহোর ১৯৮০, কিংবা ডঃ মাসউদ আহ্মদ রচিত ফায়েলে বেরেলভী আওর তরকে মাওয়ালাত, লাহোর ১৯৭১, অথবা ডঃ মাসউদ আহ্মদ কৃত তাহ্রিকে আযাদী-এ-হিন্দ্ আওর আল্ সাওয়াদ আল্ আযম গ্রন্থগুলো পড়ুন)। তিনি ইসলামের শত্রুদের শুভাকাংক্ষীও ছিলেন না। তিনি বৃটিশ এবং হিন্দু উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। খেলাফত আন্দোলন থেকে তাঁর দূরে থাকাকে বৃটিশের সাথে তাঁর গোপন আঁতাতের ফলশ্রুতি বলেই মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের আবেগ তাড়িত ফোরামে বিচার-বিবেচনার কোনো স্থানই নেই। তাই সবাই এ প্রপাগান্ডায় বিশ্বাস করে বসেন এবং প্রতিপক্ষ সফলতা লাভ করে। ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের এই জীবনী ভিত্তিক পর্যালোচনাটিই সর্বপ্রথম সত্যকে উদ্ভাসিত করে এবং মিথ্যাকেও প্রকাশ করে।

খেলাফত আন্দোলন ও তার কারণসমূহের ব্যাপারে তাঁর প্রতিপক্ষের মনোভাব আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন লিখেন ঃ

"তারা ভালভাবেই জানতো যে তারা কিছুই করতে পারবে না। তারা নিজেরাও নয়, তাদের সাথীরাও নয়। আরো হৈ চৈকে সমর্থন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। যাঁরা জ্ঞানী এবং ধার্মিক তাঁরা তাঁদের পরহেযগারীকেই অর্থহীন হৈ চৈকর শ্লোগানে মনযোগ দেয়ার চেয়ে অগ্রাধিকার দেবেন। আর যদি তাঁরা কোনো আন্দোলনে যোগ দেয়ার ইচ্ছা পোষণই করে থাকেন, তবে আহ্লে সুন্নাতের মতাদর্শই তাঁদের কাছে সব চেয়ে প্রিয়। অতএব, এ আন্দোলন এমন একটি পটভূমি সৃষ্টি করেছে যা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল

জামাআতের মতাদর্শের ঘোর বিরোধী। এর উদ্দেশ্য আহ্‌লে সুন্নাত যেন সহযোগিতা না করতে পারে এবং এর দরুন যাতে যে কেউ এ কথা বলতে পারে যে, আহ্‌লে সুন্নাত মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। তাঁরা বৃটিশের দালাল। ফলে সর্বসাধারণ যেন আহ্‌লে সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং দেওবন্দী ও ওহাবী মতবাদ যেন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।" (ইমাম আহ্‌মদ রেযা কৃত দাওয়ামুল আয়শ, পৃষ্ঠা-৯৪/৯৫)

খেলাফত আন্দোলনের মতই ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) নীতিগতভাবে অসহযোগ আন্দোলনেরও বিরোধী ছিলেন যা ১৯২০ সালে শ্রী গান্ধী আরম্ভ করেন। অবিভক্ত ভারতে মুসলমান রাজা বাদশাহ্‌দের উদারতা ও সহিষ্ণুতার দরুন হিন্দু সম্প্রদায় সর্বদাই সংখ্যা গরিষ্ঠ থাকেন, পক্ষান্তরে মুসলমানগণ সব সময়ই সংখ্যা লঘু থেকে যান। সাধারণতঃ সংখ্যা লঘুরা সংখ্যা গরিষ্ঠদের ভয় করে এবং এর উল্টো হয় না। অতএব, মুসলমানগণ বৃটিশদের চেয়ে হিন্দুদেরকেই বেশী ভয় পেতেন এবং এর দৃষ্টান্ত ও সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে। এটা কোনো রহস্য নয়। আকবর বাদশাহর শাসনামলে মুসলমানগণ ভারতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন, কিন্তু হিন্দুরা তাঁদের রাজনৈতিক কূটচাল দ্বারা এমনভাবে রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশ করেন যার দরুন খোদ দ্বীন ইসলামই হুমকির সম্মুখীন হয়। যে সকল মানুষের গভীর ঐতিহাসিক দূরদর্শিতা আছে, তাঁরা এ বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

জাতিয়তাবাদী মুসলমান ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ্ সংস্থার নেতৃবৃন্দের মনোভাব এ ঐতিহাসিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে একেবারেই নির্বিকার। তাঁরা অবিভক্ত ভারতে দীর্ঘ মুসলিম শাসনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এবং দেশের রক্তক্ষয়ী ঘটনা প্রবাহকে অবজ্ঞা করেন এবং হিন্দুদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারণ করেন এমনিভাবে-যার দরুন তাঁরা হিন্দুদেরকে নিজেদের নেতা ও পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে নেন। ইমাম আহ্‌মদ রেযা (রহঃ) এই রাজনৈতিক প্রবণতার ঘোর বিরোধী ছিলেন, কেননা এটা ইসলামের চরম ক্ষতি করছিল। যদি মুসলমানগণ হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব না করতেন এবং শুধু স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতেন, তাহলে তাঁরা ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনকে তাঁদের সহযোগী হিসেবে পেতেন। উদাহরণ স্বরূপ, পাকিস্তান আন্দোলনে যেখানে একজন হিন্দুও অংশ গ্রহণ করেন নি, সেখানে ইমাম ছাহেবের অনুসারীগণ, খলিফাবৃন্দ ও আত্মীয় স্বজন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ইমাম ছাহেবের দৃষ্টি ভঙ্গি রাজনৈতিকের চেয়ে ধর্মীয়ই ছিল বেশী। তিনি এটা পছন্দ করেন নি যে, মুসলমানগণ বৃটিশের দাসত্বের পরে হিন্দুদের রাজনৈতিক দাসে পরিণত হন এবং তাঁদেরকে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্তা বানান। জাতিয়তাবাদী মুসলমানদের অন্ধ বিশ্বাস ছিল হিন্দুদের সৎ উদ্দেশ্যের প্রতি, কিন্তু ইমাম

আহ্‌মদ রেযা খাঁনের কোনো আস্থা ছিল না হিন্দুদের উপর এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ তাঁর শংকাকেই সত্য প্রমাণিত করেছিল।

সম্প্রতি শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধীর অপ্রকাশিত গ্রন্থ My Truth (আমার সত্য) হতে কিছু উদ্ধৃতি করাচীর দৈনিক জং পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যা ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লী অফ ইন্ডিয়া নামক সাপ্তাহিকী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল উদ্ধৃতিকে পর্যবেক্ষণ ☆ করলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় জাতিয়তাবাদী মুসলমানদের প্রতি জাতিয়তাবাদী হিন্দুরা কতখানি সংকীর্ণমনা ছিলেন এবং তাঁরা মুসলমানদের ভারতে ক্ষমতাবান হওয়াকে পছন্দ করতেন না। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী নিম্নোক্ত কথা গুলোতে গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন ঃ

"যখন ডঃ জাকের হোসেইনকে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী হিসেবে আমাদের দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেয়া হলো, তখন আমাদের কংগ্রেসের বহু হিন্দু নেতৃবৃন্দ ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে একজন মুসলমানকে দেখতে পছন্দ করলেন না। আমি ভারতীয় সংসদের সদস্যবর্গ, প্রাদেশিক এসেম্বলীর সদস্যবর্গ এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি। তাঁদের সবাই এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে একগুঁয়ে ছিলেন যে, ডঃ জাকের হোসেইনের একমাত্র ত্রুটি হলো তিনি একজন মুসলমান।" (দৈনিক জং, করাচী, ২৯ শে নভেম্বর ১৯৮০ ইং, পৃষ্ঠা-১২, কলাম ৬এবং৭, নভেম্বর ১৯৮০ এর ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লী অফ ইন্ডিয়া পত্রিকা হতে উদ্ধৃত)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এ কথা পরিস্ফুট হয় যে, ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) -এর শংকা সঠিক ছিল। বস্তুতঃ যাঁরা ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ)-কে বৃটিশের দালাল বলে দোষারোপ করেন তাঁরা জাতিয়তাবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং এক জাতি তত্ত্বের সমর্থক। তাঁদের মতানুযায়ী দেশীয় মূর্তি পূজকদের শাসন বিদেশী খ্রীষ্টান মুশরিক (বৃটিশ)-দের শাসন অপেক্ষা শ্রেয়। কিন্তু দ্বীন ইসলামে দেশীয় ও বিদেশীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দেশীয় মূর্তি পূজারী কিংবা বিদেশী মূর্তি পূজারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিতে একই। জাতিয়তাবাদী মানসিকতাকে

☆ লক্ষ্যণীয় যে, খেলাফত আন্দোলনের সময় গান্ধীজী ইসলামী খেলাফতের গুণ কীর্তন করলেও পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানগণ যখন তাঁদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবী উত্থাপন করেন, তখন তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করেন। এ ঘটনা থেকেই হিন্দু নেতৃবৃন্দের মনোভাব সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করা যায়।

-(অধ্যাপক মাসউদ আহমদ)।

প্রতিহত করতে গিয়ে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) দ্বীন ইসলামের সর্বজনীনতাকে প্রচার প্রসার করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী সচেতনতা জাগ্রত করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে ইসলামী ঐক্য সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, শাসন হবে দ্বীন ইসলামের, নতুবা দেশীয় ও বিদেশী শাসন দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিতে একই হবে। আর সেই সকল মুর্তিপুজারী হলো সর্ব নিকৃষ্ট যারা মুসলমান হওয়ার কারণেই মুসলামানদেরকে হত্যা করেছে এবং এই নিধনযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছে। (ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের সময় এবং তাঁর পূর্বে ও পরে ভারতে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর হতে অদ্যাবধি পাঁচ হাজার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ভারতে সংঘটিত হয়েছে যা প্রখ্যাত হিন্দুস্থানী সাংবাদিক শ্রী কুলদীপ নাইয়ারের সংগৃহীত হিসেব থেকে জানা যায়। ১৯৬৮ সালেই ৩৪৮টি দাঙ্গা হয়েছিল। দৈনিক জং ২৫ শে নভেম্বর ১৯৮০, পৃষ্ঠা-২, ৭ম কলাম দ্রষ্টব্য। আর ১৯৮০ সালে মুরাদাবাদ, এলাহাবাদ, আলীগড় প্রভৃতি স্থানে যা ঘটেছে তা তো সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। সংক্ষেপে, বিভক্তির পরে ভারতে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে।

– অধ্যাপক মাসউদ আহ্‌মদ)

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) –এর প্রতি বিরোধিতা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। ইংরেজী ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদক প্রখ্যাত ধর্মান্তরিত মুসলিম জনাব মারমাডিউক এম, পিকথল যিনি সিন্ধু খেলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন, তিনি ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় করাচীতে এক সভায় বলেন : "আমি এমন কিছু বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে জেনেছি যাঁরা হিন্দুদের আধিপত্যকে মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করেন।" (মোহাম্মদ আফজাল ইকবাল প্রণীত Ltfe and Time of Muham-mad Iqbal, লাহোর, পৃষ্ঠা-২২০)

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) অসহযোগ আন্দোলন হতে তাঁর অসম্পৃক্ত থাকার কারণগুলো তাঁরই বহু লেখনীতে উল্লেখ করেছেন এবং ঐ আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে নিম্ন লিখিত গ্রন্থখানা উল্লেখযোগ্য আল্ মোহাজ্জাহ্ আল্ মো'তামিনা ফি আয়াতিল মোমতাহিনা। গ্রন্থের এক স্থানে বৃটিশের প্রতি স্যার সৈয়দ খানের দুর্বলতার সাথে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তাদের হিন্দু প্রীতির তুলনা করে ইমাম ছাহেব লিখেছেন :

" আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ইনসাফ করুন! সেই দাসত্ব তো ছিল অর্ধ দাসত্ব! স্যার সৈয়দ

আহ্‌মদ খাঁন তাঁর ধর্মীয় বিষয়াদিতে কোনো খ্রীষ্টান বিশপকে পরামর্শক হিসেবে গ্রহণ করেন নি ★। তিনি কুরআনের আয়াত কিংবা নবী (দঃ) –এর সুন্নাহ্‌কে কোনো গীর্জার বেদীতে উৎসর্গ করেন নি ★★। কোনো পাদ্রী পুরোহিতকে ও তিনি মসজিদে খুতবা পাঠকারী বানান নি ★☆☆। তিনি খ্রীষ্টবাদের সন্তুষ্টির সাথে খোদা তাআলার রেযামন্দিকে সংমিশ্রিতও করেন নি ★★☆☆। কোনো খ্রীষ্টান পুরোহিতকে তিনি নবী (আঃ) –এর মর্যাদাও দেন নি ★★★☆☆। আর এখন মূর্তি পূজকদেরকে সম্পূর্ণভাবে মান্য করা হচ্ছে। তাদেরকে ভালবাসা হচ্ছে এবং তারও অধিক করা হচ্ছে" ★★★☆☆☆।

শ্রী মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতি মুসলমানদেরকে এমনই জাদু করেছিল যে তাঁরা তাঁকে আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে গ্রহণ করার উদ্যোগ নেন। এ প্রসঙ্গে মিঃ এম, পিক্‌থলের নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ যা তিনি ১৯২১ সালে করেছিলেন তা উদ্ধৃত করা যথাবিহিত হবে :
" কিন্তু আমি মনে করি যে একজন উচ্চ মার্গের হিন্দু সাধুও একজন অধঃপতিত পাপী

★ এখানে মওলানা আব্দুল বারী ফিরাংগী মহলীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যিনি গান্ধীর নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে নেতা বানিয়েছিলেন। খাজা হাসান নিযামী কৃত মহাত্মা গান্ধী কা ফায়সলা, দিল্লী ১৯২০ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

★ ★ এখানে আবারো মাওলানা ফিরাগী মহলীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যিনি গান্ধীর উদ্দেশ্যে ২টি ফারসী ছত্র লিখে ছিলেন- "কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রতি নিবেদিত জীবনকে একজন মুশরিকের কদমে কোরবানি করা হয়েছে।" (ঐ)

☆☆☆ মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহার দিল্লীর জামে মসজিদের মিম্বরে শারধানন্দকে বসিয়ে তাঁকে দিয়ে একটি ভাষণ দান করিয়েছিলেন। (আবদুল ওয়াহীদ খাঁন কৃত মুসলমানো কা ইসার আওর জঙ্গে আযাদী, পৃষ্ঠা-১৪৩ দ্রষ্টব্য)

★☆☆★ মাওলানা শওকত আলী হিন্দুদের সম্মতিকে খোদা তা'লার সম্মতি বলে ঘোষণা করেন। (মোহাম্মদ জামিল কৃত তাহ্‌কিকাতে কাদেরীয়া, বেরেলী)

☆☆☆☆☆ ইসহাক আলী জাফর-উল-মুলক এ কথা গান্ধীর উদ্দেশ্যে বলেছি-লেন। (পায়সা আখ্‌বার, লাহোর, নভেম্বর ১৮, ১৯২০ ইং)

☆☆☆☆☆☆ ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন প্রণীত আল মোহাজ্জাহ্ আল্ মোতামিনাহ্ ফি আয়াতিল্ মোমতাহিনা, রেফারেন্স-রাসাইল-ই-রাযাভীয়্যা ২য় খন্ড, লা-হোর ১৯৭৬ ইং, পৃষ্ঠা-৯৪

মুসলমানের চেয়ে ভালো, কেননা উচ্চ মার্গের জন্য একটাই নিয়ম যা একজন মুসলমান, হিন্দু, খ্রীষ্টান বা ইহুদীর ক্ষেত্রে একই। এটা হলো কুরআনে প্রকাশিত খোদা তা'লার আইন।" (আফজাল ইকবাল প্রণীত Life and Time of Muhammad Iqbal পৃষ্ঠা-২২০)

সম্ভবতঃ পিতৃথল পবিত্র কুরআন মজীদের একটি আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন যা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর প্রণীত তারজুমানুল্ কুরআন ১ম খন্ডে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছিলেন; এর সারমর্ম হলো-"একজন ব্যক্তি যে কোনো ধর্মের অনুসারী হতে পারে, কিন্তু সে যদি খোদায় বিশ্বাসী হয়, তাহলে শেষ বিচার দিবসে নাজাত তার প্রাপ্য।" (রেসালাহ্ ঈমান, পট্টী, এপ্রিল ১৫, ১৯৪০ ইং সংখ্যা)

শ্রী গান্ধী এই তাফহীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তিনি শেষ বিচার দিবসে নাজাতের হকদার একজন বান্দা হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করতে শুরু করেন। তাই তিনি গুজরাটী ভাষায় তাফহীরের মধ্যে তাঁর অংশটুকুই ছেপে প্রচার করে দেন। শ্রী গান্ধী নিজেই জামেয়া মিল্লিয়া দিল্লীতে এ ঘটনা প্রকাশ করেছেন। (প্রাগুক্ত রেসালাহ্ ঈমান)

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন এ ধরনের হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন- যে ঐক্য দ্বারা একজন মুশরিককে মুসলিম উলামাদের হাতে একজন দরবেশের উচ্চ পদে আসীন করা হয়েছিল এবং যার দরুন মুসলিম জাতি ও উলামাগণ তাঁর নেতৃত্বকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তাঁরা তাঁর নেতৃত্বে গর্ব বোধ করতেন এবং ই-তহাসের বই পত্রে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছিলেন।

হিন্দুদের সাথে সহযোগিতার এই ছিল কলংক যা ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন তুলে ধরেছিলেন। এর প্রতিশোধ বুদ্ধিজীবী পর্যায়ে না নেয়া হলেও রাজনৈতিক পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। ইমাম ছাহেবকে বৃটিশের দালাল বলে অপপ্রচার চালানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল যাতে করে তাঁদের নিজেদের দোষ ত্রুটিগুলোই রেযা বিরোধী হৈ চৈর মাঝে ধামা চাপা পড়ে যায়। অতঃপর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। কিন্তু যখন হৈ চৈ থেমে গিয়েছে এবং স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে,তখন সত্যকে তার আসল রূপে দেখা যাচ্ছে। আর মিথ্যাকেও তার কদর্য রূপে দেখা যাচ্ছে। অনন্ত কাল সব কিছুকে অন্ধকারে লুকিয়ে রাখা যায় না। সমস্ত অপচেষ্টাই পন্ড শ্রম হয়েছে এবং এর থেকে সন্তাপ ছাড়া কিছুই বেরিয়ে আসে নি।

অ-সহযোগ আন্দোলনের সময় ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁনের প্রতি যে সকল অপবাদ দেয়া হয় তা মাসিক সাওয়াদুল আ'যম পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। নাইনিটালে লেফটেনেন্ট গভর্ণরকে সাক্ষাৎ করেন।

২। সরকারের পক্ষে একটি ফতোয়া লিখেন যার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ শাসকদেরকে খুশী করা।

৩। সরকার থেকে ভাতা পেতেন। (প্রাগুক্ত রেসালাহ্ ঈমান দ্রষ্টব্য)

জবাব ও জবাবের সমর্থন

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) এ সকল অপবাদের প্রতি শুধু একটাই জবাব দিয়েছেন যা অকাট্য। তিনি বলেছেন ঃ " আমি তাদের অভিযোগ গুলোর প্রতি এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উত্তর দিতে পারছি না- আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যুকদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন! আল্লাহ্ তা'লা , তাঁর প্রিয়তম রাসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং হুজুরে পাকের পুণ্যবান আশেকগণ যেন তাঁদের লা'নত দ্বারা ঐ ধরনের বদ কর্ম সংঘটনকারীদের ধ্বংস করে দেন।" (মাসিক আল্ সাওয়াদুল আ'যম, ১৯২১ ইং, পৃষ্ঠা-৩০)

এ স্পষ্ট ব্যাখ্যা সত্ত্বেও কিছু লোক সন্তুষ্ট হবেননা। ঐ ধরনের ব্যক্তিবর্গের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এমনই একজন ব্যক্তিত্বের প্রামাণ্য দলিল পেশ করা হলো যিনি অ-সহযোগ আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। যথা- মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ জাফর শাহ্ ফুলওয়ারী। তিনি কী বলছেন তা শুনুন ঃ

" অ-সহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন ছাহেবের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। অ-সহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এ মর্মে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলেন যে, ইমাম ছাহেব বৃটিশ সরকারের একজন ভাড়াটে দালাল এবং তাঁকে অ-সহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্যই ভাড়া করা হয়েছে। একজন নিরীহ মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এ ধরনের কৌশলপূর্ণ শব্দ চয়ন করা হয়ে থাকে। আমার জীবনে এ রকম হীন তৎপরতা আমি বহু বার দেখেছি। ঐ ধরণের কূটচাল সত্য না হতে পারে, কিন্তু মানুষেরা ওর সত্যতা যাচাই করতে ব্যর্থ হয়ে প্রমাণাদি না তলব করেই ওতে বিশ্বাস করে বসে। এ ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য আছে যা ব্যক্ত করেঃ চিলে কান নিয়ে গেছে, তাই চিলের পিছু ধাওয়া করা চাই।

" অ-সহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে মানুষেরা খবরের সত্যতা যাচাইয়ের তোয়াক্কা করে নি। তাই এ ধরনের খবরের সত্যতা যাচাইয়ের তাকিদ কেউই অনুভব করে নি। কিন্তু যখন বিচার বুদ্ধি সম্বিৎ ফিরে পেল, তখন ধর্মীয় একগুঁয়েমি ও সংকীর্ণতা দূরীভূত

হলো।" (মুরীদ আহ্‌মদ চিশতী কৃত খায়াবানে রেযা, লাহোর)

অনুরূপভাবে, ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের জনৈক সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব এবং ঘটনা প্রবাহের একজন প্রত্যক্ষদর্শী সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলভী লিখেছেন ঃ

"রাজনৈতিক ভাবে বলতে গেলে হযরত মাওলানা আহ্‌মদ রেযা খাঁন বাস্তবিকই একজন স্বাধীনতা প্রেমিক ছিলেন। তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তিনি বৃটিশ ও তাঁদের শাসনকে ঘৃণা করতেন। তিনি কিংবা তাঁর দুই পুত্র মাওলানা হামেদ রেযা খাঁন ও মোস্তফা রেযা খাঁন কখনোই শামসুল উলামা (উলামাদের সূর্য) জাতীয় খেতাব অর্জনের চিন্তাও করেননি। ভারতের শাসকবর্গ, সরকারী কর্মকর্তা কিংবা প্রাদেশিক অমাত্যবর্গের সাথেও তাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।" (দৈনিক জং, করাচী, ২৫ শে জানুয়ারী ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৬, কলাম ৪ এবং ৫)

তথ্যাবলী ও সাক্ষ্যসমূহ

উপরোক্ত প্রমাণাদি ও তথ্যাবলীর আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বৃটিশরা কখনোই ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনকে দাওয়াত করেন নি, যেমনিভাবে তারা দাওয়াত করেছিলেন মওলভী সৈয়দ আহ্‌মদ বেরেলভীকে। (মোহাম্মদ আলী প্রণীত মাখ্‌যানে আহ্‌মদী , মুফিদে আম, আগ্রা কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৬৭)

আর

বৃটিশরা কখনোই ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনকে সাহায্য করেন নি, যেমনিভাবে তাঁরা সাহায্য করেছিলেন মওলভী সৈয়দ আহ্‌মদ বেরেলভীকে। (হুসেইন আহ্‌মদ মাদানী কৃত নক্‌শে হায়াত, দিল্লী ১৯৫৪, পৃষ্ঠা-১২/১৩)

আর

বৃটিশদের সম্পর্কে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন মওলভী ইসমাইল দেহেলভীর মত এ কথাও বলেন নি "আমরা বৃটিশ শাসনে সকল স্বাধীনতা ভোগ করছি। যদি কোনো বহিঃশত্রু তাঁদেরকে আক্রমণ করে, তবে মুসলমানদের উপর সেই শত্রুকে লড়াই করা এবং তাঁদের সরকারকে প্রতিরক্ষা করা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে।" (মীর্জা হায়রাত দেহেলভী প্রণীত হায়াতে তাইয়েবা, দিল্লী, পৃষ্ঠা-২৯৬)

আর

হেজাযের রাজা আব্দুল আযীয ইবনে সৌদ বৃটিশের সাথে চুক্তি করার পর বৃটিশরা তার

মত ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন সম্পর্কে এ কথাও বলেন নি-" আবদুল আযীয বিন আবদ্ আল্ রাহমান বিন ফয়সাল আস্ সউদ তার পুত্র ও পৌত্র সহকারে দীর্ঘদিন যাবত বৃটিশের সাথে একটি বন্ধুত্বের চুক্তি করতে চেয়েছিল।" (এ চুক্তিটি ১৮ ই সফর ১৩৩৪ হিজরী মোতাবেক ২৬ শে নভেম্বর ১৯১৫ সালে সম্পাদিত হয়। এতে বৃটিশের অধিরাজিত্বকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। ভারতের ভাইস্‌রয় মিঃ চেমস্‌ফর্ড ও আবদুল আযীয ইবনে সউদের স্বাক্ষর এতে রয়েছে। তথ্যসূত্রঃ সারগুযাশত্ -এ -হেজায, লক্ষ্ণৌ ১৩৪৫ হিজরী-১৯২৭ ইং, পৃষ্ঠা-৪২/৪৩)

আর

বৃটিশরা আবদুল আযীয ইবনে সউদকে যেভাবে 'সিতারায়ে হিন্দ' খেতাব দান করেছিলেন সেভাবে তাঁরা কখনোই ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনকে কোনো পদক দান করেন নি। (১৯১৬ ইং সালে বৃটিশ সরকার 'সিতারায়ে হিন্দ' খেতাবটি রাজা ইবনে সউদকে দান করেন। বৃটিশ সরকারের উপসাগরীয় প্রতিনিধি স্যার পারসি্ কক্স তাকে কুয়েতে এ পদকটি পরিয়ে দেন। সারগুযাশত্-এ-হেজায গ্রন্থের মধ্যে এর ফটো ছাপা হয়েছে-১৮ পৃষ্ঠার উল্টো পৃষ্ঠায় দেখুন।)

আর

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব মওলভী নযীর আহ্‌মদের মত ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যও করেন নি অথবা কোনো ইংরেজ মহিলাকেও নিরাপত্তা প্রদান করেন নি ☆ । - "সেটা ছিল একটা অভ্যুত্থান, বাহাদুর শাহ্ ছিলেন না। সেই বুড়ো বাহাদুর শাহ্ কীই বা করতে পারতেন? তাঁকে তো আমরাই পরামর্শ দিতাম। কিন্তু তিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের হাতে একটি ক্রীড়নক। তিনি কিছুই করতে সক্ষম ছিলেন না।" (ফযল হোসাইন বিহারী কৃত আল্ হায়াত বাদাল মামাত্ পৃষ্ঠা-১২৫)

আর

মওলভী নাযির হুসেইনের মত ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনকে বৃটিশ কমিশনার কোনো সনদ দেন নি এ মর্মে -"মওলভী নাযির হুসেইন দিল্লীর একজন প্রখ্যাত আলেম যিনি সংকটময় মুহূর্তগুলোতে বৃটিশের প্রতি অনুগত ছিলেন।" (দিল্লীর কমিশনারের চিঠি, তাং-১০/৮/১৮৮৩ ইং, তথ্যসূত্র ঃ ফযল হুসেইন বিহারী কৃত আল হায়াত বাদাল মামাত্ করাচী ১৯৫৯ ইং, পৃষ্ঠা-১৪০)

☆ ফযল হোসাইন বিহারী রচিত আল্ হায়াত বাদাল মামাত্, করাচী ১৩৭৯ হিজরী, পৃষ্ঠা-১২৭

আর

স্যার সৈয়দ আহ্মদের মতো ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন ঘোষণা করেন নি যে, বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অপরাধ। অথবা এ কথাও তিনি বলেন নি-"আমি নিজে একজন ওহাবী; ওহাবী হওয়া কোনো অপরাধ নয়, কিন্তু সরকারের অবাধ্য হওয়া একটি অপরাধ।" (আলতাফ হুসেইন হালী রচিত হায়াতে জাওয়াইদ, ৫ম অধ্যায়, লাহোর, ১৯৬৫ ইং, পৃষ্ঠা-১৭৫)

আর

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সম্পর্কে সে কথা বলেন নি যা স্যার সৈয়দ আহ্মদ ওহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

১। "বিদ্রোহ (সিপাহী বগ্নিব) চলাকালীন সময়ে ওহাবীদের আনুগত্য ছিল দৃঢ় এবং তারা বৃটিশ সরকারের প্রতি চির অনুগত ছিল।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৭)

২। " বৃটিশ শাসনের অধীনে ওহাবীরা যে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে তা আর কোথাও নেই। তাদের জন্য ভারত হলো দারুল্ আমান (শান্তির দেশ)।" (মাকালাতে স্যার সৈয়দ, ৯ম খন্ড, মজলিসে তরক্কীয়ে আদব, লাহোর, ১৯৬২ ইং, পৃষ্ঠা-২১২)

আর

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) বৃটিশের আধিপত্যকে স্বীকার করে মওলভী রশিদ আহ্মদ গাঙ্গুহীর মতো এ ধরনের তোষামোদপূর্ণ কথাও বলেন-"আমি বাস্তবিকই সরকারের অনুগত থেকেছি। মিথ্যা অভিযোগ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যদি আমি নিহত হইও, তবুও সরকারই সর্বেসর্বা। তার যা ইচ্ছা করতে সে সক্ষম।" (আশেক আলী মিরাটী কৃত তাযকিরাতুর রশীদ, ১ম খন্ড, মাহ্বুব প্রেশ, দিল্লী, পৃষ্ঠা-৮০)

আর

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন হাহেব মওলভী শিবলী নোমানীর মতো ফতোওয়াও জারী করেন নি এ মর্মে-"বৃটিশের আনুগত্য করা মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাধ্যতামূলক।" (মোহাম্মদ ইক্রাম লিখিত শিবলী নামা পৃষ্ঠা-২৪৫ এবং সোলায়মান নদভী প্রণীত হায়াতে শিবলী, আহমগড়, ১৯৪৩ ইং, পৃষ্ঠা-৬৩৪)

আর

নদ্ওয়াতুল্ উলামার মতো ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন কোনো বৃটিশ কর্তা ব্যক্তি দ্বারা তাঁর মাদ্রাসাহ্ দারুল উলুম মানযারে ইসলামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করান নি।

(মোহাম্মদ ইকরাম প্রণীত শিবলী নামা, পৃষ্ঠা-২৪৫ এবং সোলায়মান নদভী কৃত হায়াতে শিবলী, আ'যমগড় ১৯৪৩ ইং, পৃষ্ঠা-৪৮২)

আর

নদ্ওয়াতুল উলামার মত মানযারে ইসলামের জন্য কোনো দানও মঞ্জুর করা হয় নি। (মোহাম্মদ ইকরাম কৃত শিবলী নামা, পৃষ্ঠা-১৭৮ এবং সোলায়মান নদভী প্রণীত হয়াতে শিবলী, আ'যমগড়, ১৯৪৩ ইং, পৃষ্ঠা-৬৩১/৩২)

আর

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন ছাহেব ক্বারী মোহাম্মদ সোলায়মান মনসুরপুরীর মতো নিম্নোক্ত মন্তব্যও করেন নি-" আমি আশা করি যে, কোনো মুসলমানই আল্লাহ্ তা'লার হুকুমের আলোকে সরকারের অবাধ্য কিংবা বিরুদ্ধাচরণকারী হতে পারবেন না। কেননা তাঁরা (বৃটিশরা) অপবিত্র কাজ-কর্ম, অনৈতিক ক্রিয়া ও বিদ্রোহ নিষেধ করেন। মুসলমানদের উচিৎ চির দিন এই আদেশ স্মরণ রাখা।" (ক্বারী মোহাম্মদ সোলায়মান মনসুরপুরীর সভাপতির ভাষণ, নিখিল ভারত আহ্লে হাদীস্ কনফারেন্স, আগ্রা, ৩০/৩/১৯২৮ ইং)

আর

মাদ্রাসায়ে দেওবন্দের মতো কোনো বৃটিশ সরকারী কর্মকর্তা মাদ্রাসায়ে মানযারে ইসলাম সম্পর্কে এ কথা বলেন নি-"এ মাদ্রাসা সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বরং সরকারের অনুগত ও সাহায্যকারী।" (আখ্বারে আঞ্জুমান পাঞ্জাব, লাহোর, তাং-১৯/২/১৮৭৫ ইং)

আর

কোনো বৃটিশ সরকারী কর্মকর্তা এ কথাও বলেন নি-"উত্তর প্রদেশের গভর্ণর স্যার উইলিয়াম মুইর আজ অনুপস্থিত বলে আমি দুঃখিত। অত্যন্ত আনন্দ সহকারেই তিনি মাদ্রাসাটি পরিদর্শন করতেন এবং ছাত্রদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করতেন।" (মাসিক আল্ রশীদ পত্রিকা, দারুল উলুম দেওবন্দ নম্বর দ্রষ্টব্য, লাহোর, ফেব্রুয়ারী/মার্চ ১৯৭৬ ইং, পৃষ্ঠা-১৯৬)

আর

দারুল্ উলুম দেওবন্দের মতো ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) কখনোই কোনো অমুসলিম নেতাকে তাঁর মাদ্রাসার একাডেমিক কিংবা ধর্মীয় সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য দাওয়াত করেন নি। তিনি মজলিছে উলামাকেও হেয় প্রতিপন্ন করেন নি কোনো অ-

মুসলমানকে সভাপতি বানিয়ে। (দৈনিক জং, ১৬/৩/৮০ ইং, পৃষ্ঠা-১২, কলাম-৮, প্রাগুক্ত, ২১/৩/৮০ ইং, পৃষ্ঠা-১২, কলাম -৮; প্রাগুক্ত, ২৩/৩/৮০ ইং, পৃষ্ঠা-২, কলাম-৬; প্রাগুক্ত, ২০/৩/৮০ ইং, পৃষ্ঠা-১, কলাম-৩; প্রাগুক্ত, ২২/৩/৮০ ইং, পৃষ্ঠা-১, কলাম-৫ এবং ৬; প্রাগুক্ত, ৩/৪/৮০ ইং, পৃষ্ঠা-৪, কলাম ৭ এবং ৮)

আর

ভূপালের নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁনের মতো ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব কখনোই এ কথা বলেন নি-"আমি ৩০ বছর যাবত ভূপালের বাসিন্দা। বৃটিশ সরকার সার্বিকভাবে এ রাজ্যের এবং বিশেষ করে দীনহীন সিদ্দিক আলী খাঁনের আনুগত্য ও শুভাকাংক্ষা লক্ষ্য করেছেন।" (সিদ্দিক হাসান খাঁন প্রণীত তরজুমানে ওয়াহ্‌হবীয়্যা, লাহোর, ১৩১৩ হিজরী, পৃষ্ঠা-৯ এবং ২৯)

আর

নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁনের মতো ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে ইমাম ছাহেব এ কথাও বলেন নি-"ভারতে সংঘটিত এই বিদ্রোহকে জেহাদ হিসেবে বর্ণনা করা হলো তাদেরই কাজ যারা ইসলামকে বোঝে না এবং দেশে গন্ডগোল -হট্টগোল বাধাতে চায়।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১০৬)

আর

অ-সহযোগ আন্দোলনের নেতাদের মতো কখনোই ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব ভারতীয় মুসলমান সৈনাদেরকে তুর্কী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেন নি। অথবা তিনি মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহরের মতো নিজ পাপ স্বীকার করার কালে এ কথাও বলেন নি-" আমরা ১৫০০ কোটি রূপী যুদ্ধের জন্য দান করেছি এবং লক্ষ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেছি। আমরা আমাদের ঈমান বিক্রি করে দিয়েছি। মুসলমানগণ তাঁদের ভ্রাতৃগণকে হত্যা করেছেন। কিন্তু এ বিশাল কোরবানির জন্য ক্ষতিপূরণ অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক।" (১৯১৯ সালে অমৃতসরে নিখিল ভারত কংগ্রেস সেশনে মোহাম্মদ আলী জওহারের ভাষণ ঃ তথ্যসূত্র রইস্ আহ্‌মদ জাফরীর সংকলিত আওরাকে গুম গুশ্‌তা, লাহোর, ১৯৭৮ ইং, পৃষ্ঠা-১২০)

আর

মওলভী আশরাফ আলী থানভীর মতো প্রকাশ্যে বৃটিশের পক্ষে এ রকম কোনো ফতোয়াও ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব দেন নি- "প্রাচীন কাল থেকেই খ্রীষ্টানদের

আইন ও ধর্ম অন্য কোনো ধর্মের বিরোধিতা করে না অথবা সমাজে আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপও করে না। তাই তাঁদের প্রজা হওয়া অনুমতি প্রাপ্ত।" (১০ই সফর ১৩৪৯ হিজরী ১৯৩১ ঃ তথ্যসূত্র রইস্ আহ্‌মদ জাফরী কৃত আওরাকে গুম গুশ্‌তা, পৃষ্ঠা-৩২৪)

আর

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর কোনো শিষ্য তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলেন নি যা মাওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ উসমানী মওলভী থানভী সম্পর্কে বলেছেন-"হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছিলেন আমাদের পুণ্যবান আলেম ও বুযর্গ। কিছু মানুষ এমন কী তাঁকে বলতেও শুনেছেন যে তিনি সরকার থেকে মাসিক ৬০০ রূপী গ্রহণ করেছেন। একই সময়ে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, বৃটিশ সরকার তাঁকে কত টাকা ভাতা দিতেন তা তিনি জানতেন না।" (মোহাম্মদ যাকী দেওবন্দী কৃত মোকালমাতুল সাদরাইন, ২৭ শে যেলহজ্জ ১৩৬৪ হিজরী, দারুল ইশা'আত দেওবন্দ)

আর

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের কোনো শিষ্য তাঁর সম্পর্কে এ কথা বলেন নি যা মাওলানা হাফিজুর রহমান সিওহারভী তবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস্ মেওয়াটী সম্পর্কে বলেছেন- " মাওলানা ইলিয়াসের তবলীগী আন্দোলন হাজী রশীদ আহ্‌মদের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতো। পরবর্তীকালে এটা বন্ধ হয়ে যায়।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮)

এটা বাস্তব ঘটনা যে, সময়ের চড়াই উৎরাইয়ে উপরোল্লিখিত কর্তা ব্যক্তিদের কেউ কেউ বৃটিশের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের রাজনীতি সব সময়ই বৃটিশের পক্ষে ছিল। পক্ষান্তরে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের রাজনীতির সমস্ত দিকই নির্মল ছিল। এটা ঐতিহাসিক দলিল প্রমাণ সমর্থিত এবং সেই মোতাবেক এর স্বীকৃতি হওয়া উচিৎ। যারা জীবনের কোনো না কোনো সময় বৃটিশের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁদের গুণগ্রাহী থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদেরকেও বৃটিশ দালাল বলে প্রদর্শন করা হচ্ছে না। এমতাবস্থায় ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব এই গৌরবের আরো অনেক বেশী হকদার। তাঁর পবিত্র জীবন বৃটিশের দালাল হওয়ার অভিযোগ থেকে এত মুক্ত ছিল যে এর অস্বীকার করার দরকারই পড়ে না। যা এখানে দরকার তা হলো ইতিহাসকে তার সঠিক রূপে লিপিবদ্ধ করা।

বস্তুতঃ ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) প্রত্যেকটি ভ্রান্ত দল-উপদল যথা-মুশরিক, মূর্তি

পূজক, ইংরেজ, ইহুদী, শিয়া, কাদিয়ানী ইত্যাদিকে ইসলামের শত্রু বিবেচনা করতেন। তাঁর বেছালের মাত্র এক মাস আগে তিনি দুইটি পংক্তি আবৃত্তি করেছিলেন যা তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত করে ঃ

" আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী ব্যক্তি কিংবা সম্প্রদায়

হোক মুরতাদ কিংবা মূর্তি পূজক বা খ্রীষ্টান,

অথবা হোক ইহুদী বা অগ্নি উপাসক,

আমাদের শত্রু নিশ্চয়।" (মোহাম্মদ মোস্তফা রেযা খাঁন কৃত আত্‌তারীউদ্‌দারী, ২য় খন্ড, বেরেলী ১৯২১ ইং, পৃষ্ঠা-৯৯)

পাকিস্তান সরকারের সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী খাঁন হোটী উপরোক্ত সত্যকে বর্ণনা করেছেন এভাবে-"ফায়েজে বেরেলভী মুসলমানদের বুদ্ধি বৃত্তিক ও ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি বিষয়ের উপর সর্বমোট প্রায় ১০০০ টি কেতাব রচনা করেছিলেন। তিনি মুসলমান সমাজকে এই বাণীই শুনিয়েছিলেন যে, আমাদেরকে সকল প্রকার অধার্মিকতা বর্জন করতে হবে। বৃটিশের সাথে অ-সহযোগের যে গুরুত্ব ছিল তার চেয়েও বেশী গুরুত্ববহ ছিল হিন্দুদের সাথে অ-সহযোগ। কেননা হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের সাথী কিংবা সহানুভূতিশীল হতে পারেন নি।" (ইয়াওমে রেযা তথা রেযা দিবস উপলক্ষে ভাষণ, রাওয়ালপিন্ডি, জানুয়ারী ১৭, ১৯৮০ ইং, তথ্যসূত্র ঃ "উফাক' পত্রিকা, করাচী, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং, পৃষ্ঠা-২৮)

আমাদের সামাজের কতিপয় ইতিহাসবিদ ও গবেষক যারা পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারনার ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন, তাঁদের উচিৎ নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি উপরোক্ত তথ্যাবলীর আলোকে পরিশুদ্ধ করা এবং ইতিহাসের যথাযথ উপস্থাপন দ্বারা মুসলিম উম্মাহ্‌কে সঠিক পথে পরিচালনা করা। যা করা হয়েছে তা ভুলে যাওয়া উচিৎ। এখন একটা সত্যনিষ্ঠ প্রয়াস প্রয়োজন যাতে করে সঠিক ইতিহাসকে পুনরায় লেখা যায় যা ডঃ ইশতিয়াক হোসেইন কোরেশীর মতানুযায়ী পক্ষপাতদুষ্টভাবে লেখা হয়েছিল। ডঃ কোরেশী বলেন ঃ" যখন আমি উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের বিষয়ের উপর গবেষণা চালাচ্ছিলাম, তখন আমি অনুভব করেছি যে, জেহাদ আন্দোলনের উপর লিখিত সমস্ত কিছুই পক্ষপাতদুষ্ট।" (রেযা দিবসে মজলিছে মোযাকারাতে ভাষণ, করাচী, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ ইং)

একটি পংক্তি ঃ

"রাতের আকাশে বিষাদময় তারকাদের সমাবেশ,

আলোকময় সূর্যোদয় দ্বারা তিরোহিত হবে।"

৩য় সংস্করণের সাথে সংযুক্ত অংশ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

(ক)

এ গ্রন্থখানা (গুনাহে বেগুনাহী বাংলা নাম-ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব) ১৯৮১ সালে ভারতের মোবারকপুরস্থ আল্ মজমাউল ইসলামী কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্রচার সংখ্যা ছিল ২০০০ কপি। অতঃপর পাকিস্তানে প্রথম বারের মতো মারকাযে মজলিছে রেযা কর্তৃক এর আরো ২০০০ কপি ছাপা হয় ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ সালে। এ সংস্করণটি ২ মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। মারকাযে মজলিছে রেযা সংস্থাটি নিজস্ব ২য় সংস্করণে আরো ২০০০ কপি ছাপে, তবে এ সংস্করণও কয়েক মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এখন ৩য় সংস্করণ ও সংযুক্ত অংশ পাঠকের সামনে পেশ করা হলো।

এ প্রকাশনার পর পরই দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকগণ এটাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এখানে সেই সকল মতামতের কয়েকটি বিধৃত হয়েছে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, জ্ঞান ও দূরদর্শিতা সম্পন্ন সকল মানুষই এটাকে বুঝেছেন, বরণ করে নিয়েছেন এবং এর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

১। ডঃ পীর মোহম্মদ হাসান, পাকিস্তান ভাওয়ালপুর ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী সাহিত্যের প্রাক্তণ অধ্যাপক বলেন-"একটি চমৎকার বই এবং ডঃ মাস্‌উদ আহ্‌মদ সাহেব তা যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন।" (মওলভী মোহাম্মদ মুরীদ আহ্‌মদ চিশতীর নামে ৪ঠা মার্চ ১৯৮২ তারিখের পত্র)

২। অধ্যাপক আবরার হুসেইন, আল্লামা ইকবাল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান। তিনি বলেন-"গ্রন্থখানা অকাট্য যুক্তিতে পরিপূর্ণ। কোনো আপত্তি উত্থাপনের কোনো অবকাশই নেই। (ডঃ মাসউদ আহ্‌মদকে প্রেরিত ২২/০৩/১৯৮২ইং পত্র)।

৩। অধ্যাপক এম, এসহাক কোরেশী, গভর্মেন্ট কলেজ, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান, বলেন- "আমি আপনার গ্রন্থখানা লাহোরস্থ মজলিছে রেযা থেকে সংগ্রহ করেছি। আমি এটা পড়েছি এবং উপভোগ করেছি। আল্লহ্‌তা'য়ালার কৃপায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সন্তোষজনক আলোচনা করা হয়েছে। আপনার লেখনীর ধারা অত্যন্ত ভালো। বিষয়টির

সকল দিকই আলোকপাত করা হয়েছে।" (ডঃ মাসউদ আহ্‌মদকে প্রেরিত ২৪/০৩/৮২ তারিখের চিঠি।

৪। দৈনিক জঃ, করাচী, এপ্রিল ১৬, ১৯৮২ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৭, কলাম-৭ লিখেছে "স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ বইটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।"

৫। মাসিক আল্ আশরাফ, করাচী, সেপটেম্বর ১৯৮২ সংখ্যা, পৃষ্ঠা -৪৫ লিখেছে- "প্রতিপক্ষের যদি সত্য ও যুক্তিকে বরণ করে নেয়ার গুণাবলী থেকে থাকে, তবে তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে বাধ্য হবেন এ বইটি পাঠ করে।"

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের প্রতিপক্ষের কিছু ব্যক্তি বিচার বিবেচনাশীল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ধরনের একজন বিবেচনাশীল ব্যক্তি যিনি অবসরপ্রাপ্ত স্কুল হেড মাষ্টার তিনি যখন এ বইটি পড়লেন, তখন তিনি বল্লেন ঃ "মওলানা আহ্‌মদ রেযা খাঁনের বিরুদ্ধে আমার মনে যা পক্ষপাত ছিল তা অপসারিত হয়েছে।" কিন্তু আরো কিছু লোক আছে যারা সূর্যের কিরণ সত্ত্বেও সূর্যকে অস্বীকার করে থাকে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে জনৈক অধ্যাপক নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন- "কেন মানুষ এত সংকীর্ণ মনা যে সত্যকে সে প্রত্যাখ্যান কিংবা অবজ্ঞা করে! এ আচরণ আজকাল সার্বিক। একবার যা শোনে তাই সে আঁকড়ে ধরে থাকে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো এই যে, ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) সম্পর্কে বহু মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তারা শোনা কথাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। এটা সত্যি অবোধগম্য।" (ডঃ মাসউদ আহ্‌মদকে প্রেরিত ২৪/০৩/৮২ইং তারিখের পত্র)

সারা বিশ্বে এটাই হলো সত্য ও ন্যায় প্রেমিকদের কণ্ঠস্বর। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা সত্য দর্শন করতে পারছেন না দেখে সকলে বিস্মিত। কিন্তু আসলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বর্তমান যুগের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হলো প্রপাগান্ডা। শিক্ষা, জ্ঞান, দর্শন ও যুক্তি সবই এর গোলাম। এই অস্ত্রই ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। একটা দলিলিক প্রমাণও এ ক্ষেত্রে মওজুদ আছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের বেছালের ছয় দিন পরে, অর্থাৎ ৩রা নভেম্বর ১৯২১ ইং সালে লাহোরের বিখ্যাত দৈনিক 'পয়সা' পত্রিকা একটা শোক জ্ঞাপক সম্পাদকীয় ছেপেছিল। এর কপি আমাকে সরবরাহ করেছেন লাহোরস্থ কেন্দ্রীয় মজলিসে রেযা সংস্থার সেক্রেটারী জনাব জহুরউদ্দীন খাঁন ছাহেব। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল যে, যারা হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব ও বৃটিশের সাথে অ-সহযোগিতা করতো, তারা ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিল। তারা তাঁকে এড়িয়ে চলতে এবং হেয়

প্রতিপন্ন করতে কোনো প্রচেষ্টা বাকী রাখে নি। এ সত্ত্বেও ইমাম ছাহেব তাঁর অবস্থানে অবিচল ও অটল থাকেন। (পয়সা আখবার, লাহোর, তাং-০৩/১১/১৯২১ইং)

১৯২১ইং সালে আরব্ধকৃত বৈরী প্রপাগান্ডা ৬০/৭০ বছরের পরিক্রমণের পরও অদ্যাবধি চলছে। কতিপয় বুদ্ধিজীবী বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করে এবং শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে অপমান করে এতে অংশ গ্রহণ করছেন। জনৈক শিক্ষিত অধ্যাপক তাঁর ক্লাসে ছাত্রদের যা বলেছেন তা তাঁর জনৈক ছাত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

"অধ্যাপক সাহেব ঘোষণা করেন যে আ'লা হযরত ছিলেন দেওবন্দের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত বৃটিশেরই একজন ক্রীড়নক এবং তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থরাজি নিছক ভাঁওতাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। বৃটিশরা অন্যান্য মানুষদের দ্বারা ঐ সকল পুস্তক লিখিয়ে আ'লা হযরতের নামে ছেপে দিয়েছিল।" (ডঃ মাসউদ আহ্‌মদকে লিখিত জনৈক ছাত্রের পত্র, তাং ১০/০৪/১৯৮২ইং)।

সত্য গোপন করার ও মিথ্যার বেসাতির এটা হলো সর্ব নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তরুণ প্রজন্মকে পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত যা তাঁদের মান মর্যাদার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছিলেন তাঁর সময়কার আলোক স্তম্ভ। পায়সা আখবারের সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছেন ঃ "ভারতে ইসলামী বিষয়াবলীর তথা নিয়ম-কানুনের তিনিই ছিলেন আলোক স্তম্ভ।" (পায়সা আখবার, লাহোর, তাং-০৩/১১/১৯২১ইং)

এটা কোনো ভক্তের কণ্ঠস্বর নয়, বরং একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিকের কণ্ঠস্বর। এ কণ্ঠস্বর বেরেলী থেকে নির্গত নয়, বরং লাহোর থেকে নির্গত। এটা শ্রুত হওয়ার হকদার। সত্য বটে, ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছিলেন জ্ঞানের সূর্য যা কাছে এবং দূরের স্থানে একইভাবে আলোক বিস্ফুরণ করেছিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। আরব ও আজমের উলামা ও বুদ্ধিজীবীগণ এটা স্বীকার করেছেন। দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কে কী বলা যায়। উদীয়মান সূর্য ও সূর্যালোককে অস্বীকার করা হচ্ছে। এ অস্বীকৃতির প্রক্রিয়াটি হয়তো সুদূর প্রসারিত। হয়তো মানুষের অবহেলার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের রূহ তাঁর আলোক রশ্মি গুলোকে (অর্থাৎ, ভক্তদেরকে) নিম্নোক্ত সংবাদ দিয়ে গিয়েছেন-

"আবার এসো এবং আমার দীপ্তিমান হৃদয়ে প্রবেশ করো,

বাগান, বনানী, দরজা ও দেয়াল গুলো চিরতরে ছাড়ো।"

অতঃপর সংবাদটি গ্রহণের পর

"সূর্য আকাশের সকল প্রান্ত থেকে তাদের মস্তককে উত্থিত করে,

এবং পরিত্যক্ত পুত্রকে আলিঙ্গণ করতে এগিয়ে আসে।"

বস্তুতঃ অর্ধ শতাব্দীর সময়কাল ব্যাপী এই সূর্যটি আধুনিক বিশ্বের অন্তরালে ছিলেন। তাঁর কিরণ রশ্মিগুলোও (অর্থাৎ, ভক্তবৃন্দ) নিশ্চুপ থাকে। কিন্তু অবশেষে একটি নির্ভীক সূর্য রশ্মি এগিয়ে এসে বলতে চেয়েছে-

"আমায় প্রজ্জ্বলিত করতে দাও ততক্ষণ,

প্রাচ্যের প্রতিটি অণু পৃথিবীর জন্য একেকটি মশাল না হয় যতক্ষণ।"

(ডঃ মাসউদ নিজেকে বুঝিয়েছেন-অনুবাদক)

"হিন্দুস্তানের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে আমি নিরন্তর প্রভা ছড়াবো,

যতক্ষণ না ওর ঘুমে অচেতন মানুষ জাগ্রত হয়।"

ফলে পৃথিবী আবারো আলোকিত হয়েছে। সূর্য আবারো তার কিরণ বিস্তুরণ করছে। কেউ স্বীকার করুক বা নাই করুক, দর্শন ক্ষমতা যাঁদের মঞ্জুর হয়েছে তাঁরা স্বীকার করছেন।

(খ)

কাহিনীর শুরু হয়েছিল জনৈক অধ্যাপককে নিয়ে যাঁর সম্পর্কে ভালভাবেই বলা হয়েছিল যে তিনি শোনা কথায় বিশ্বাস করতে এতই ব্যস্ত যে নিজের জন্য সরেজমিনে তদন্ত করার ফুরসৎ তাঁর নেই। তিনি এমন এক শিক্ষিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের দৃষ্টি শক্তি নেই কিন্তু শ্রবণ শক্তিই একমাত্র ভরসা। একমাত্র সত্যকে তার আসল রূপে দর্শন করার অক্ষমতা এবং শোনা কথায় বিশ্বাস করার দরুনই এই সকল ব্যক্তি ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনকে বৃটিশের দালাল বলে অপবাদ দেন। আমাদের এ গ্রন্থের মূল সুরই ছিল এ অপবাদটিকে খন্ডন করা। বহু কথা এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, এক্ষণে ভিন্ন কিছু কথা বলা হবে। নিম্নোক্ত তথ্যাবলি ও প্রমাণাদি আমাদের গ্রন্থের প্রকাশনার পরে আমাদের গোচরিভূত হয়েছে।

(১)

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে বলেন-"আল্লাহ্‌র কাছে শোকরিয়া, অনেক দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু আমি কাঠের স্লেটে একটি ইংরেজী অক্ষরও লিখি নি।" (ইমাম আহ্‌মদ রেযা কৃত মোসাফ্‌ফির আল্ মাতালী, ১৩২৪ হিজরী, পৃষ্ঠা-১)

এ লেখনীটি প্রতিভাত করে যে ইমাম ছাহেব ইংরেজ ও তাঁদের ভাষা উভয়কেই ঘৃণা করতেন। আমরা বৃটিশদের ভাষার প্রেমে বিভোর, অথচ এর পরও আমরা বৃটিশ

বিদ্বেষী ও ইসলাম প্রেমিক বলে নিজেদের দাবী করি।

(২)

ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব বলেন-"তোমাদের বিশ্বাস নষ্ট হয় কিংবা উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে বিরূপ ধারনা সৃষ্টি হয় এমন ভাষা ইংরেজী শিক্ষা করা নিষেধ।" (ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন প্রনীত ফতোয়ায়ে রেযাভীয়্যা, তাবৃদা, ১৯৮১ইং, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা -২৪)।

(৩)

ইমাম ছাহেবকে জানানো হয় যে, জনৈক মওলভী সাহেব অহরহ একজন খৃষ্টান পুরোহিতের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি খৃষ্টানটির সাথে আহার গ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অথচ পুরোহিতটি প্রিয় নবী (দঃ) ও তাঁর সাহাবীদেরকে হেয় করে কথা বলেন। মওলভীকে পুরোহিতের সাথে সাক্ষাৎ করতে বারণ করা হয়েছে, কিন্তু মওলভী নিষেধাজ্ঞার দলীল দাবী করছেন। এ ধরনের মওলভী সম্পর্কে শরীয়তের সিদ্ধান্ত কী? ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ "যদি তিনি ঈমান সম্পর্কে জানতেন, তাহলে তিনি বুঝতেন যে কুরআন মজীদ এক্ষণে তাঁকে খৃষ্টানদের পর্যায়ভুক্ত করছে।" (প্রাগুক্ত ফতোয়ায়ে রেযাভীয়া, পৃষ্ঠা-৪৫/৪৬)

একজন ইংরেজ পুরোহিত ধর্মীয় বিতর্ককালে মহানবী (দঃ) -কে হেয় করে বক্তব্য রাখুক তা ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব বরদাশত্ করতে পারতেন না। তাই তিনি বলেছেন যে একজন মওলভী যদি ঐ ধরনের কোনো পুরোহিতের সাথে ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা বজায় রাখে, তাহলে তার মুসলমানিত্ব রহিত হয়ে যাবে।

(৪)

কাদিয়ানী সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টিতে বিশ্বাস করে না, যদিও বাকী সকল মুসলমানই ওতে বিশ্বস করেন। কাদিয়ানীরা যে সুযোগ ও সুবিধা বৃটিশদের কাছে পেয়েছিল তা সর্বজন বিদিত। যদি ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন ছাহেব বৃটিশের কাছ থেকে সুবিধা ভোগী হতেন, তাহলে তিনি কাদিয়ানীদের প্রতি দয়া পরবশ হতেন, কিন্তু তিনি বৃটিশ কিংবা কাদিয়ানীদের প্রতি একটুও করুণা না করে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টির উপরে একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করেন। এ পুস্তকটি তাঁর বেছাল প্রাপ্তির বছরেই রচিত হয়। সেই বছরটিতেই তাঁকে বৃটিশের দালাল বলে অপবাদ দেয়া হয়। পুস্তকটি বৃটিশ ও কাদিয়ানীদের মতবাদ খন্ডন করেছে। প্রতিকূল সময়েও ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) দ্বীনকে অটুট রাখতে চেয়েছেন। তিনি দ্বীন ইসলামের একজন নির্ভীক হেফাযতকারী এবং এর জন্য

সংগ্রামকারী ছিলেন।

(৫)

এ কথা বলা হয় যে, ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) বৃটিশের সাথে অ-সহযোগের বিরোধী ছিলেন। আসলে এটা সত্য নয়। তিনি সকল বে-দ্বীনের সাথেই সহযোগিতার বিরোধী ছিলেন এবং তিনি চৌদ্দ'শ হিজরীর খ্রীষ্টানদেরকে বে-দ্বীন বিবেচনা করতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল অভিযোগের উর্ধ্বেঃ "প্রত্যেক বে-দ্বীনের সাথে সহযোগিতাই নিষিদ্ধ।" (প্রাগুক্ত ফতোয়ায়ে রেযাভীয়া, পৃষ্ঠা-১২) মানসিক কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক সামঞ্জস্যই প্রকৃত বন্ধুত্বের উৎস। যখন দুইটি দলের মধ্যে মৌলিক বিশ্বাস ভিন্ন হয়, তখন অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ঐ ধরনের দুইটি দলের মধ্যে বন্ধুত্ব তখনই সম্ভব হবে, যখন একটি দল অপরের স্বার্থে নিজ বিশ্বাস কোরবানি করে। এ কারণেই অ-মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মৌলিক আকিদা বিশ্বাসকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও হেফাযত দিতে হবে। ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) ইসলামের মৌলিক আকিদা বিশ্বাস বিনষ্ট করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ। ইসলাম ও মুসলমানদের একজন শুভাকাংক্ষীকে বৃটিশের শুভাকাংক্ষী বলে প্রচার করা হলো মানবেতিহাসে সর্ব নিকৃষ্ট তথ্য বিকৃতি। এটা কঠোরভাবে নিন্দনীয়। (হায়াতে মওলানা আহ্‌মদ রেযা দ্রষ্টব্য)

ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন বৃটিশের দালাল ছিলেন না মর্মে প্রমাণ করতে গিয়ে আমরা এ বইখানায় এমন কিছু তথ্যের উপর আলোকপাত করেছি যাতে প্রতিভাত হয়েছে যে ইমাম সাহেবের প্রতিপক্ষই বৃটিশের পক্ষে কোনো না কোনো সময় দালালি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রমাণ হাতে এসেছে।

মওলভী মোহাম্মদ হাসান দেওবন্দী ও মওলভী আশরাফ আলী থানভীর শিক্ষক এবং উপমহাদেশ খ্যাত ব্যক্তিত্ব ক্বারী আবদুর রহমান আনসারী পানিপুতী সম্পর্কে ক্বারী এম, এ, হালীম একটি বই লিখেছেন। এ বইয়ের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লেখক ক্বারী সাহেবের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর পরহেগারী, পরার্থিতা ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য নিম্নোক্ত দুইটি ঘটনার বয়ান দিয়েছেন –

১। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে যখন বান্‌ডা (BANDA) এলাকার মানুষেরা বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখন ক্বারী সাহেব তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেন মানুষদেরকে বিদ্রোহ থেকে নিবৃত্ত করতে। উলামাগণ জেহাদের পক্ষে একটি ফতোয়া ইতিপূর্বে জারী করেছিলেন। ক্বারী সাহেব লিখিত আকারে এবং ভাষণে তা খন্ডন করে জন সাধারণকে বিদ্রোহের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত করেন। (এম, এ, হালীম আন্‌সারী প্রণীত তাযকিরায়ে রহ্‌মানিয়্যা, পানিপথ, ১৯৩৮ ইং পৃষ্ঠা-৬১/৬২)

২। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ চলাকালে যখন দুর্বৃত্তরা নিরীহ বৃটিশ নারী ও শিশুদের উপর যুলুম করার অপচেষ্টা করেছিল, তখন ক্বারী সাহেব এই উচ্ছৃংখল আচরণের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে প্রকাশ্যে এই শয়তানী কর্মের নিন্দা জানিয়েছিলেন। বিদ্রোহ যখন তুঙ্গে, তখন পঁচাত্তর জন বৃটিশ নারী ও পুরুষ তাঁর কাছে আশ্রয়ের জন্যে আগমন করেন। ক্বারী সাহেব আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (দঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহ্‌র খাতিরে এই সকল অসহায় বৃটিশ নারী পুরুষকে তাঁর মদ্রাসায় আশ্রয় দেন এবং তাঁর ছাত্র ও কর্মচারীদেরকে আদেশ দেন যেন তারা বৃটিশ নারী পুরুষদেরকে রক্ষা করে এবং খাদ্য দান করে। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬২)

উপরোক্ত ঘটনাবলী ক্বারী সাহেবের মাহাত্ম্য, মানবিক সহানুভূতি ও পরার্থিতা প্রতিভাত করে। এ রকম পরিষ্কার প্রমাণাদির আলোকে আমরা তাঁকে বৃটিশের শুভাকাংক্ষী বলে দোষারোপ করতে পারি না। কিন্তু যদি ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যেতো, তাহলে তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়া হতো না। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খাঁন (রহঃ) তাঁর প্রতি আরোপিত অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, কিন্তু বহু ন্যায়পরায়ণ ও নৈষ্ঠিক ব্যক্তিও এ অভিযোগ থেকে মুক্ত নন। তাহলে কেন নির্মলকে ময়লা এবং প্রকৃতকে নকল বলে প্রচার করার এই চেষ্টা? আর কতদিন চলবে এই মিথ্যার বেসাতি এবং সত্য গোপনের অপপ্রয়াস? এখন সময় হয়েছে এই অধ্যায়ের ইতি টানার। এটা শিক্ষিতদের মুখে চুনকালি লেপন করেছে। বিষয়টি সমাজের কোনো একটি অংশকে ঘিরে ব্যাপৃত নয়। এটা সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। সত্যকে সঠিকভাবে বিবৃত করতে হবে। জাতিসমূহ তাদের ভবিষ্যত এই ধরনের সত্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে তোলে। আমাদের হৃদয়সমূহ এবং দৃষ্টি ক্ষমতা উভয়ই এই ধরনের সত্যের আকাংক্ষী। আমাদের পূর্ব পুরুষদের আত্মা সমূহ এই ধরণের সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য আহবান জানাচ্ছেন। ইতিহাসবিদের কলম সত্যকে তুলে ধরতে ইচ্ছুক। আমাদের হৃদয়ও এই সত্যকে সুস্বাগতম জানাতে দ্বার খুলে দিয়েছে ঃ "বিপদ বা ঝুঁকি যতই হোক না বড়,

জিহ্বা ও হৃদয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ একাত্মতা আবশ্যক,

এটাই এ জগতের প্রারম্ভ থেকে তাপসদের আজ্ঞা।"

-মোহাম্মদ মাসউদ আহ্‌মদ

২রা রবিউস্ সানী ১৪০৩ হিজরী,

১৭ই জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং।